বিপ্লবী সূর্য সেন বক্তৃতামালা

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ও সূর্য সেন

শ্রীনিকুঞ্জ সেন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৮৯

মূল্য—২০·০০

সুপারিনটেন্ডেন্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্তৃক,
৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা ১৯, হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লেখকের কথা

বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য্যসেন যেমন একটি বিচ্ছিন্ন নাম মাত্র নয়, তেমনি চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ-ও বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা মাত্র নয়। অতীত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের, বিশেষ করে সশস্ত্র বিপ্লবের যে অভিযানগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রতিটির সঙ্গে মনের দিক দিয়ে যুক্ত এই মহানায়ক সূর্য্যসেন ও তাঁর পরিকল্পিত যুব-বিদ্রোহ। তাই সূর্য্যসেন ও তাঁর যুব-বিদ্রোহের কার্য্যকারণের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে পেছনে ফেলে আসা ইতিহাসের ঐ ঘটনাবলীর সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই অতীতের বৃটিশ-বিরোধী কয়েকটি আন্দোলন ও সংঘর্ষের উল্লেখ আমি করেছি। বলেছি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা, সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা, ওয়াহবী আন্দোলনের কথা, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কথা ও বাঙলার নীলবিদ্রোহের কথা। মাত্র এ ক'টিকে বেছে নিয়েছি এই জন্য যে আমার মনে হয়েছে এদের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন সশস্ত্র বিপ্লবের পরবর্ত্তী যুগের পথ-স্রষ্টারা। বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য্যসেন তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। শুনেছি বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য্যসেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে অতীতদিনের বিভিন্ন বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন, এবং তা থেকে যা গ্রহণ করবার তা গ্রহণ করেছেন, যা বর্জনীয় তা বর্জন করেছেন।

ইতিহাসের শিক্ষার আলোকেই তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী। সেই কারণেই অতীত দিনের পটভূমিকায়ই আমি বলতে চেষ্টা করেছি মহানায়ক সূর্য্যসেনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শের কথা। "ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব ও সূর্য্যসেন" নামক আমার বক্তব্য বিষয়ে আমি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের কথাও কিছু বলেছি, কেননা, ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টায় ভাব-বিপ্লবের প্রভাবও অসামান্য। তাছাড়া ইংরেজ চরিত্রের সমালোচনা করতে গিয়ে বৃটিশ-শাসনের সঙ্গে ওদের শোষণের রথও যে কি দুর্বারবেগে চলেছে তারও উল্লেখ আমি করেছি। তবুও যেন অনেক কথাই না-বলা রয়ে গেছে। থাকতে হয়ত বাধ্য। এ কাহিনীর ত শেষ নেই। তাই শেষ কথা আজকে নয়।

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ও সূর্য্যসেন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সূর্যসেন বক্তৃতামালার আজ আট বছর পূর্ণ হচ্ছে, এইজন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে আমরা ৩৫ বছরে পদার্পণ করেছি ; অথচ যাঁদের নেতৃত্বে, যাঁদের ত্যাগ ও দুঃখবরণে, যাঁদের সংগ্রাম-সাধনায় এ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তাঁদের কথা আমরা জানি না। যাঁর নামে এ বক্তৃতামালার আয়োজন, এদেশের বহু লোকই তাঁর কথা জানেন না। এতবড় অজ্ঞতার বোঝা, এতবড় অভিশাপকে বহন করে চলেছি আমরা বছরের পর বছর। রক্তের অক্ষরে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যাঁরা লিখে রেখে গেলেন পথে ও প্রান্তরে, পাহাড়ে কন্দরে, গ্রামে গঞ্জে তাঁদের কথা আমরা জানতে পারলাম না স্বাধীনতা প্রাপ্তির এত বছর পরেও। মাসের পর মাস চলে গেল লেখা হল না ইতিহাস, বছরের পর বছর চলে গেল পূর্ণ হল না আমাদের আয়োজন। আমরা যে-তিমিরে ছিলাম সে-তিমিরেই রয়ে গেলাম। ভাগ্যের কথা অজ্ঞতার এ অন্ধকার দূর করবার কাজে এগিয়ে এসেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরা যে সূর্য্যসেন বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করেছেন এজন্য দেশবাসী তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। একটা জাতির মানসিক অগ্রগতির পরিমাপ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। তাই যখন দেখা গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত খ্যাতনামা একটি বিশ্ববিদ্যালয় সূর্য্যসেন বক্তৃতামালার আয়োজন করেছেন তখনই মনে হল পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবের যে একটি অনবদ্য ভূমিকা ছিল দেশের শিক্ষিত সমাজে তা স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছে। এ স্বীকৃতির মূল্য অপরিসীম। সূর্য্যসেন বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা দেন বিপ্লবীনায়ক শ্রীগণেশ ঘোষ। সেই বক্তৃতার মুখবন্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেন, "স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত। অথচ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস সঙ্কলন ও রচনা আমরা করে উঠতে পারি নি। জাতীয় এই গ্লানির অপনোদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সীমিত হলেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারায় আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত ও গর্ব্বিত।"

"ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এই সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রূপলাভ করে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী অমূল্য প্রাণদান করেছেন এই স্বদেশ মুক্তিব্রতে। কিন্তু, আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, সাধারণভাবে এই মুক্তিসেনাদের "সন্ত্রাসবাদী" নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা জানি চট্টগ্রাম জেলায় মহানায়ক সূর্য্যসেনের (মাষ্টারদা) নেতৃত্বেও শত শত তরুণ, মুক্তিপাগল দেশপ্রেমিকের আত্মবলিদানে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, তাকে "সন্ত্রাসবাদী" আন্দোলন বলা হলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। ঋষি অরবিন্দ, মহানায়ক সুভাষচন্দ্র, মুক্তিসেনা বিনয়-বাদল-দীনেশ যে আগ্নেয় সংগ্রাম করেছিলেন, তা মূলতঃ স্বদেশপ্রেমের অগ্নিশিখায় দীপ্ত। অহিংস আন্দোলনের পুরোহিত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সংগ্রাম, এদের সংগ্রাম স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সেই "ছোট ইংরেজ"কে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের রসদ এসেছিল মূলতঃ দু'টি সূত্র থেকে—এক, যাঁরা, সশস্ত্র যুদ্ধের চিরাচরিত পন্থানুযায়ী জীবনপণ করে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে এগিয়েছিলেন, আর অন্যদিকে যাঁরা গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত নরমপন্থায় অহিংসার অস্ত্র ধরে এই সংগ্রামে নেমেছিলেন। এদের কারো অবদানকে ছোট করা হলে সত্য ইতিহাস লেখা হবে না। এঁরা "সন্ত্রাসবাদী" নন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র যোদ্ধা। আর গান্ধীজীর পন্থা যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন এই সংগ্রামের অহিংস যোদ্ধা। এই দুই শ্রেণীর যোদ্ধার যুক্ত সংগ্রামের ফলে আমরা পেয়েছিলাম ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের স্বাধীন মুক্ত ভারত। তাই তাঁরা যথার্থ দেশপ্রেমিক, মুক্তিসংগ্রামী ছিলেন।"

উপাচার্য্যের এই উক্তি ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে তা সত্যের আলোকে উদ্‌ভাসিত। সত্যিকারের ইতিহাস আমাদের নেই বলে ভুল বুঝাবুঝিরও অন্ত নেই। ছোটকাল থেকে পড়ে এসেছি ইংরেজদের হাতে লেখা ইতিহাস। ওরা যা লিখেছে তা আমরা শুনেছি, পড়েছি ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছিও। তাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম আমাদের কাছে সামান্য সিপাহীবিদ্রোহ মাত্র। শিবাজী, সমগ্র বিশ্বের কাছে দস্যু, সশস্ত্র বিপ্লবীরা টেরোরিষ্ট্। 'শিবাজী'র কথা বলতে গিয়ে তাই একদিন রবীন্দ্রনাথ গভীর দুঃখে বলেছিলেন :

"বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলে করে পরিহাস
ঘোর অট্টরবে
তব চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে।"

শুধু বিদেশীদের কথা কেন, আমরা নিজেরা কি করছি! স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সদিচ্ছা হল যে স্বাধীনতার ইতিহাস একটা রচনা করতেই হবে। ডাকা হল খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের। কিন্তু বাদ-বিসম্বাদ শুরু হয়ে গেল গোড়া থেকেই। ঐতিহাসিকদের কাছে বলা হল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমেই এসেছে স্বাধীনতা—তাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে ইতিহাস লেখা হবে তাতে শুধু থাকবে মহাত্মাজীর কথা, সত্যের কথা, অহিংসার কথা। সশস্ত্র-বিপ্লব পন্থায় যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের কারো কথা থাকবে না এ ইতিহাসে। থাকবেন না ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সত্যেন বসু, যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী; থাকবেন না নলিনী বাগচি, তারিণী মজুমদার, বিনয়-বাদল-দীনেশ; থাকবেন না প্রদ্যোৎ, অনাথ, মৃগেন, যতীন দাস, শুকদেব, রাজগুরু; থাকবেন না যাদুগোপাল, বিপিন গাঙ্গুলী, হেমচন্দ্র ঘোষ, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী; থাকবেন না সূর্য্যসেন ও নেতাজী। প্রয়াত খ্যাতনামা ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদারকে ডাকা হয়েছিল ঐ ইতিহাস লেখার কাজে। তিনি রাজী হন নি। কেন না সত্যিকারের ঐতিহাসিক যিনি তিনি কারো হুকুমমত ইতিহাস রচনায় রাজী হতে পারেন না। তিনি বিদায় নিলেন। বলে এলেন, একক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকারের ইতিহাস তিনি লিখবেন। তিনি তা লিখেছেন, শেষও করেছেন। শোনা যায় তাঁর লেখা ইতিহাস পাঠ করে কংগ্রেস নেতৃবর্গ হতাশ হয়েছেন, কেননা তিনি লিখেছেন:

"....The revolutionary movement which became a potent force in Indian politics during the Swadeshi movement continued, with checks and breaks up to the end of the civil disobedience movement of Gandhi. The two movements—one violent and another non-violent went on side by side, and

it was almost inevitable that each should be influenced by the other. There was a temporary support of the revolutionaries to Gandhian non-violence in 1920-21, but the suspension of the non-co-operation movement brought it to an end. Many old revolutionaries mellowed by age and experience remained in Gandhi's Camp, or retired from politics, but new recruits joined the revolutionary groups and revolutionary ideas fat a firmer grip on the people."

কংগ্রেস নেতৃবর্গ হয়ত গলার জোরে ডঃ মজুমদারের এই উক্তি নস্যাৎ করে দেবেন। কিন্তু তাতেও ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যাবে না।

যে জাতির ইতিহাস নেই, বিশ্বের দরবারে সে জাতির কোন মূল্যই নেই। এতদিন আমাদেরও তা ছিল না। আজও সরকারের নির্দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস লেখা হচ্ছে তাতেও সত্য চিরদিনের জন্য নির্বাসিত। সূর্যসেন বক্তৃতামালার মধ্য দিয়ে বছরের পর বছর এই সত্যটি যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিদীপে তুলে ধরতে সক্ষম হন তবে সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার পথ-স্রষ্টারূপে এঁদের অবদান হবে অবিস্মরণীয়।

আজ যাঁর নামে এই বক্তৃতামালার ব্যবস্থা সেই মহানায়ক সূর্যসেনকে বা মাষ্টারদাকে খ্যাতনামা এক বিপ্লবী বললে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হবে না, কারণ সূর্যসেন ত কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম মাত্র নয়, সূর্যসেন একটি সুদূরপ্রসারী কল্পনার বাস্তব রূপরেখা, একটি মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শের স্বচ্ছ দৃষ্টি-প্রদীপ। সূর্যসেন আজন্ম বিপ্লবী, এই বিপ্লবীর চোখে একদিন ধরা দিয়েছিল পরিপূর্ণ স্বাধীনতার রূপ। সারা জীবন সেই রূপের আরাধনাই তিনি করেছেন। সংগ্রহ করেছেন মৃত্যুর সমিধ; জীবনের পথে পথে। তারপর ডাক যখন এসেছে, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পেছনের দিকে চান নি, ঘরের মায়া সংসারের বাঁধন কিছুই মানেন নি। শুধু একটি কথাই তাঁর মনে হয়েছে, সম্মুখে ঐ ত পথ, যে-পথ তৈরী করেছেন তাঁর পুরোযাত্রীরা। ঐ পথের ডাকেই একদিন সম্মুখ সমরে প্রাণ দিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, জ্যোতিষ পাল, নীরেন ও মনোরঞ্জন, ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মোৎসর্গ করেছেন আমির চাঁদ, বসন্ত বিশ্বাস, অবোধ, বিহারী ও বালমুকুন্দ প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকবৃন্দ। এঁরাই

ভারতের পঞ্চাশবর্ষ ব্যাপী বিপ্লবের দ্বিতীয় যুগের প্রবাদপুরুষ। প্রথম যুগে আছেন মারাঠার চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল ও সত্যেন বসু প্রমুখ শহীদের দল। তৃতীয় যুগের সূচনায় সূর্য্যসেন ও শেষ পর্বে নেতাজী। ভারতবর্ষের সশস্ত্র বিপ্লবের এই ত ইতিহাস।

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবকালের ব্যাপ্তি। অবশ্য এরও বহু বর্ষ পূর্বে বহুস্থানে বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতবাসীরা করেছে। এই সংগ্রামগুলির অধিকাংশই সাধারণ মানুষের সংগ্রাম। ঐতিহাসিকদের মতে ঐসব সংগ্রাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃটিশ বিরোধী হলেও ঠিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের আওতায় পড়ে না, কেন না এই সব সংঘর্ষে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সকলেই যে পরাধীনতার গ্লানি হতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তা নয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ। তাই পলাশী বিপর্যয়ের পরে প্রতিটি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকেই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলন বললে আমরা ভুল করব। দৃষ্টান্তস্বরূপ সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কথা বলা যেতে পারে। ১৭৬৭ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ৩৩ বছরের এই কৃষকবিদ্রোহকে কি নামে অভিহিত করা যাবে! স্বাধীনতা সংগ্রাম? ঐতিহাসিকরা বলবেন, নিশ্চয়ই না। অনেক লেখকের অভিমত এই যে, ঐ ফকিররা ছিলেন যাযাবর। কিন্তু, বৃটিশ শাসনের সরকারী তথ্য-অনুসন্ধানী ঐতিহাসিক উইলিয়াম হাণ্টার বলেছেন, "সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঐ সন্ন্যাসীরা ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর বেকার ও বুভুক্ষু সৈন্যগণ এবং বাঙলার জমিহারা, গৃহহারা বুভুক্ষু কৃষক। এই অন্নবস্ত্রহীন বেকার সৈন্য ও কৃষক উভয়েই জীবিকা নির্বাহের শেষ উপায় হিসাবে বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।" পরস্পর বিরোধী এই দুই মতের মধ্যে কোনটা সত্য তার বিচার করবে ইতিহাস। কিন্তু একথা আজ সর্ব্ববাদীসম্মত যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই রচিত; আর এই 'আনন্দমঠ'ই ছিল ভারতবর্ষের ছোটবড় সব বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস। তাহলে দাঁড়াল এই যে, যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে আমরা কেউ কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামের গণ্ডীর মধ্যে আনতে সঙ্কোচ বোধ করেছি

সেই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহই বিংশ শতাব্দীতে বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হিসাবে সমাদৃত হয়েছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ওয়াহবী বিদ্রোহ সম্পর্কেও ঐ একই কথা। এই বিদ্রোহ দুটিও ইংরেজ বিরোধী। কিন্তু বিচার্যবিষয় এই যে স্বাধীনতা সংগ্রামের আওতার মধ্যে এরা আসে কিনা। এই দুটি বিদ্রোহ সম্পর্কেও মতবিরোধ অন্তহীন। সাঁওতাল বিদ্রোহকে ঐতিহাসিকরা বলবেন আঞ্চলিক বিদ্রোহ, আর ওয়াহবী বিদ্রোহকে অনেকে বলেন সাম্প্রদায়িক। বিচার বিশ্লেষণে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। সাঁওতাল বিদ্রোহ সূচিত হয় ১৮৫৫ সালে—চলে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে এই কৃষক বিদ্রোহের শুরু। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এটা স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়, তবে সমগ্র দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, শুধু "সাঁওতাল পরগণার" স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লক্ষাধিক সাঁওতাল সৈন্য সংগৃহীত হয় ও তারা কলকাতা অভিযান শুরু করে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সিঁধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। পুরোপুরি দু'বছর চলেছিল এ বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করতে গিয়ে কয়েকটি বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত ও নিহত করে ফেলে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা। এই পরাজয়ের ফলে কিছু দিনের জন্য সমগ্র সাঁওতাল পরগণা বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। বেশ কিছুদিনের চেষ্টায় বৃটিশ সরকার সে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়, সত্যি কথাই, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণার উৎস হিসাবে ইতিহাস কি আজ সে বিদ্রোহকে অস্বীকার করতে পারে? পারে না। বড় জোর বলতে পারে, সমগ্র ভারতবর্ষের অগণরূপ ধরা দেয় নি ওদের কাছে। ওরা শুধু ওদের কথাই ভেবেছে—ওদের নিজেদের কথাই বলেছে। পথে পথে গান গেয়েছে "হল, আরম্ভ হল। চারদিকে শালগাছের ডাল পাঠাও। দারোগা নেই, হাকিম নেই, সরকার নেই। এবার সাঁওতালদের রাজত্ব এসেছে।"—এসেছিল। ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল্য কতখানি তা তুলাদণ্ডে ওজন করে নিশ্চয়ই নেবেন ঐতিহাসিকরা, কিন্তু, এ বিদ্রোহ যে সেদিন ভারতের মহাবিদ্রোহকে প্রেরণা দিয়েছে সে-কথা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে? উপায় নেই, তার প্রধান কারণ এইসব সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র ছিল মনের সুদৃঢ় সঙ্কল্প।

তা নাহলে শুধু লাঠি সোটা, তীর ধনুক, এইসব সম্বল করে ওরা মাসের পর মাস লড়াই করল কি করে।

ওয়াহবী বিদ্রোহ

এর পরের উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ, 'ওয়াহবী বিদ্রোহ' নামে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়েছে। ব্যাপ্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ এই ওয়াহবী বিদ্রোহ। কেননা এ বিদ্রোহ চলেছে প্রায় ৫০ বছর। মহাবিদ্রোহের পূর্ব্বে ও পরে। ভারতবর্ষে ওয়াহবী আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমেদ। তিনি তীর্থ দর্শনে মক্কায় যান। সেটা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক। মক্কায় তখন ওয়াহবী আন্দোলনের প্রভাব প্রচণ্ড। সে আন্দোলন তাঁকে এমনভাবে আকর্ষণ করে যে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে এই আন্দোলন দেশে প্রবর্তন করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই সঙ্কল্প গ্রহণের কারণ এই যে নতুন ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা এর উদ্দেশ্য হলেও সে-ধর্ম্মরাজ্য হবে শোষণহীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। সাধারণ ধর্ম্মরাজ্যের বিভেদ ও সঙ্কীর্ণতার চিহ্নমাত্র এতে থাকবে না। 'ওয়াহবী' শব্দের তাৎপর্য্যগত অর্থ নব-জাগরণ। এই নব-জাগরণের স্বপ্ন নিয়ে এই আন্দোলন প্রবর্তন করেন আরবের আবদুল ওয়াহেব, আরবদেশের তরুণদের উপর ওয়াহবী আন্দোলনের ছিল সীমাহীন প্রভাব। ঐতিহাসিক ডঃ সুপ্রকাশ রায়ের অভিমত এই যে মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধনের জন্য এই নতুন ধর্মমত জন্মলাভ করলেও সেই ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে একটা বিদ্রোহের আহ্বান সুস্পষ্ট। এই আন্দোলন জায়গীরদার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়, কেননা দেশবাসী ততদিনে উপলব্ধি করেছে যে এই জায়গীরদার ও জমিদারের পেছনে আছে বৃটিশ-সিংহ। তাই ওদের এত তেজ। এই উপলব্ধির পরে ওরা সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এই ওয়াহবী আন্দোলন যে আসলে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন, এমন একটা অভিমতও এই দেশে প্রাধান্য লাভ করেছিল। কথার অবশ্য কারণ যে কিছু না ছিল তা নয়। এর প্রথম কারণ এই যে ১৮২৭ সালে পাঞ্জাবে শিখদের বিরুদ্ধে ওয়াহবীদের বিরাট সংঘর্ষ শুরু হয়। আর তার নেতৃত্ব করেন স্বয়ং সৈয়দ আহম্মদ। সে যুদ্ধ সেদিন ধর্ম্মযুদ্ধ নামেই

অভিহিত হয়েছিল। এর দ্বিতীয় কারণ এই যে, আরবদেশের ওয়াহবীরা ভারতবর্ষকে বলত "দার-উল-হারাব" অর্থাৎ শত্রুর দেশ। ভারতবর্ষে তখন বৃটিশ শাসন। তাই শত্রু কারা? ভারতবর্ষের অধিবাসীরা না ভারতবর্ষের শাসকরা? যদি অধিবাসীরা শত্রু হয়ে থাকে তবে ত ওয়াহবী আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নামেই চিহ্নিত করতে হয়। তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামে এই আন্দোলনের অবদান কিছু থাকে না। আর যদি শত্রুর দেশ মানে ইংরেজ অধিকৃত দেশ হয়ে থাকে তবে ওদের বৃটিশ-বিরোধিতা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের আখ্যা না পেলেও তা যে সে সংগ্রামকে শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "ওয়াহবীর শক্তি কোন ধনী বা প্রভাবশালী শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। তাদের আবেদন ছিল জনগণের কাছে, এবং তাদের ধর্ম বা রাজনীতির মূলসূত্র ছিল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এ কথা তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আন্দোলন পরিচালনার দোষ ত্রুটি যাই থাক না কেন, পলাশীর পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এত ব্যাপক সংগ্রাম ওয়াহবীরাই শুরু করে।"

এই মন্তব্যের সমর্থনে বাঙলার ওয়াহবী নেতা তিতুমীর-এর বৃটিশ বিরোধিতা উল্লেখযোগ্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোর এই তিনটি জেলায় সাময়িকভাবে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারকে উৎখাত করতে বৃটিশ রাজ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। কয়েকবার তিতুর কাছে বৃটিশ বাহিনী পরাজিত হয়। তিতুমীর এক বাঁশের কেল্লার সাহায্যে বৃটিশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত তিতু পরাজিত ও নিহত হন।

মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭)

মহাবিদ্রোহ সম্পর্কেও ঐ একই কথা। ঐতিহাসিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ত একে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিকরাও এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। অবশ্য যাঁরা লেখক অথচ ঠিক ঐতিহাসিক নন্ তাঁরা

প্রায় সবাই একে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে ইতস্ততঃ করেন নি। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ শ্রীপ্রতুল চন্দ্র গুপ্ত সম্প্রতি মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে লিখিত একটি পুস্তকের সমালোচনায় লিখেছেন, "১৮৫৭-র বিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্তির সময় ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ সেন লিখিত 'এইটিন ফিফটি সেভেন' এবং ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখিত 'দি সিপয় মিউটিনি এ্যাণ্ড দি রিভোল্ট অফ্ এইটিন ফিফটি সেভেন' এই দুটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা দু'জনেই এই বিষয়টির উপর বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। দু'জনের মত যে একেবারে পরস্পরবিরোধী তা নয়, কিছু কিছু প্রভেদ আছে। ডক্টর সেন বলেছেন একথা প্রমাণ হয়েছে যে দেশের খুব বড় অংশে দেশবাসীরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা এমন নয় যে তাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যেতে পারে। যাকে আমরা বলি জাতীয়তাবাদ তার তখনও জন্ম হয় নি। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এই কথা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, ১৮৫৭ সালের যুদ্ধকে স্বাধীনতালাভের জন্য প্রথম যুদ্ধ কিংবা জাতীয় যুদ্ধ বললে ভুল হবে। যাঁরা একসঙ্গে রাজনৈতিক নেতা এবং ঐতিহাসিক তাঁরা অবশ্য এমত মানবেন না। বিনায়ক দামোদর সভারকার কিংবা অশোক মেটা দু'জনের লেখার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। তাঁরা দু'জনেই বিশ্বাস করেন ১৮৫৭-র যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডক্টর শশিভূষণ চৌধুরীর মতও তাই।" শ্রীপ্রতুল চন্দ্র গুপ্ত এই মন্তব্য করেছেন ক্রিষ্টোফার হিবার্টের লেখা সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে। প্রতুলবাবুর মতে হিবার্টের বিশ্বাস যে সিপাহী বিদ্রোহের পেছনে রাজনৈতিক কারণ যদি না থাকত তাহলে সে বিদ্রোহ কিছুতেই এত ব্যাপক আকার ধারণ করত না।

ইংরেজ ঐতিহাসিক, মিঃ ম্যাল্‌সন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে (History of the Indian Mutiny) এ বিদ্রোহের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি বড় বড় প্রদেশের জনসাধারণের অধিকাংশই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, তাছাড়া পশ্চিমবিহার, পাটনা বিভাগের বহু জেলা ও মীরাট বিভাগের কতকাংশে জনসাধারণ ও সিপাহীরা প্রায় একই সময়ে বিদ্রোহ করেছিল। এই একই

মত প্রকাশ করেছেন আরো একাধিক বৃটিশ ঐতিহাসিক। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত আমরা এর আগে লিখেছি। সেখানে দেখেছি যাঁরা এ মহাবিদ্রোহকে first war of India's National Independence বলতে চান তিনি তাঁদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: This is neither first, nor national, nor it is a war of independence. এখন দেখা যাক মহাবিদ্রোহকে জাতীয় আন্দোলন বলতে কেন চান না তিনি। ডঃ মজুমদার-এর অভিমত এই যে এ যুদ্ধ শুরু করেছিল সিপাহীরা, চালিয়েছেও তারাই, জনসাধারণের সমর্থন এতে ছিল না। পরে অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তার কারণও ঐ সিপাহী বিদ্রোহ। অর্থাৎ সিপাহীরা যদি বিদ্রোহ না করত তবে জনসাধারণের মধ্যেও বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতো না। তাই যেহেতু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসমষ্টি এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি তাই national একে বলা চলে না। তার পরের কথা ডঃ মজুমদার এ সংগ্রামকে war of independence বলতে চান নি। কারণ?—কারণ এই যে ডঃ মজুমদারের মতে যে সংগ্রাম দেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয় তাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা কিছুতেই চলতে পারে না। তাই তাঁর মতে এটা স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ত নয়ই। অবশ্য একথা তিনি স্বীকার করেছেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে, এ বিদ্রোহ গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কিন্তু সে অভিযানকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনসাধারণের সংগ্রাম বলতে তিনি নারাজ। তাঁর মতে এ অভ্যুত্থানের জন্য ইংরেজ শক্তিই দায়ী। সিপাহী বিদ্রোহ একথা জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করেছে যে বৃটিশ শক্তির ভিত অত্যন্ত দুর্ব্বল। প্রবল আঘাত হানতে পারলেই তা শেষ হয়ে যাবে। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিই জনগণকে তাদের স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আসলে এর পেছনে ইংরেজ রাজশক্তিকে স্বদেশ থেকে উৎখাত করার মত স্বদেশপ্রেম তাদেরকে এ যুদ্ধে উদ্দীপিত করে নি। তাঁর মতে ব্যক্তিবিশেষ হয়ত বা স্বদেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল, কিন্তু জনসাধারণ কোন উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় নি। তারা

এসেছিল এ স্থবর্ণস্থযোগকে তাদের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাতে। এ যুক্তি যে অত্যন্ত দুর্ব্বল তা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। জনসাধারণ বলতে ডঃ মজুমদার কাদের কথা বলতে চান? যদি তারা দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ হয়ে থাকে তবে তাদের আবার নিজ নিজ স্বার্থ কি? নিজ নিজ স্বার্থ থাকতে পারে উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিবিশেষের, জনসাধারণের নয়। ডঃ মজুমদারের এই অভিমতকে সমর্থন করেন নি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডঃ এস. এন. সেন। মহাবিদ্রোহের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ধর্ম্মযুদ্ধ নামে যার শুরু, স্বাধীনতাযুদ্ধে তার পরিসমাপ্তি। কেন না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বিদ্রোহীরা বিদেশী সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। ডঃ সেন আরো বলেছেন, অযোধ্যায় এ বিদ্রোহ স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এর ব্যাপকতার কথা প্রসঙ্গে ডঃ সেন বলেন, কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লবে স্বল্প সংখ্যক লোকই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং সেই সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের পেছনে যদি অধিকাংশ দেশবাসীর সমর্থন থাকে তবেই তাকে জাতীয় অভ্যুত্থানের আখ্যায় ভূষিত করা চলে। ডঃ সেনের এই মত যদি গ্রহণযোগ্য হয় তবে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে আমরা কোন্ নামে অভিহিত করব? এর ব্যাপকতা সম্পর্কে যাঁরা প্রশ্ন তোলেন তাঁদের এ মহাবিদ্রোহের ক্ষয়ক্ষতির কথা একটু হিসেব করে দেখতে বলি। শ্রীসুকুমার রায় তাঁর 'ভারতবর্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন: এই বিদ্রোহ প্রায় আড়াই বছর যাবৎ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকে এবং দুই লক্ষ ভারতীয় মৃত্যু বরণ করে। এ বিদ্রোহ দমন করতে বৃটিশরাজের চার কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে পলাশী বিপর্যায়ের পরে ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে খণ্ড যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১২টি। এই ১২টি রণক্ষেত্রে প্রায় ৪৩ হাজার ভারতবাসী জীবন উৎসর্গ করেছে। বিগত ঐ ১০০ বছরের ইতিহাসে প্রায় ত্রিশ কোটি অধ্যুষিত দেশে বছরে ৪০০ ভারতবাসীর মৃত্যুবরণ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্কল্প-সাধনে এ মৃত্যুবরণ আরো সামান্য মনে হয় এই কারণে যে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের সংখ্যা ২ লক্ষেরও উপর। সুতরাং এই মহাবিদ্রোহের ব্যাপকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না।, অন্যের কথা থাক। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে

সুভাষচন্দ্র যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা শুনলে সন্দেহাতীতভাবে আমরা বুঝতে পারি এটা সত্যি সত্যি ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৯৪৩ সালে বাহাদুর শা'র স্মৃতি-স্তম্ভের স্মরণ-উৎসবে তিনি রেঙ্গুনে বলেন : "বাহাদুর শা'র স্মৃতিচরণ আমরা করি কেন না তিনিই একমাত্র নেতা যাঁর পতাকাতলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। এসেছিলেন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে, বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে—হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সবাই। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন এ সংগ্রামকে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ 'সিপাহী বিদ্রোহ' বললেও আমরা ভারতবাসীরা জানি যে এ সংগ্রাম ভারবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম : **The first war of independence.**

১৮৫৭তে সংঘটিত হয়েছিল মহাবিদ্রোহ অর্থাৎ পলাশী বিপর্য্যয়ের প্রায় ১০০ বছর পরে। ইতিহাসে দেখেছি এই একশ বছরে ইংরেজকে দম ফেলতে দেয় নি ভারতবাসীরা। ইংরেজকে প্রথমে চিনতে পারে নি তারা, বিশেষ করে দেশের উচ্চ এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা। চিনতে পারেন নি সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বয়ং। তাই তাদেরকে বিনা বাধায় মোগল-ভারতে বাণিজ্যের অবাধ সুবিধা দেওয়া হয়। এই সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে গিয়ে তারা ব্যবসার নামে আগ্রা, আহমেদাবাদ, বরোচ, সুরাট, মসুলিপটন প্রভৃতি স্থানে ফাক্টরী ত স্থাপন করেই, উপরন্তু, কয়েকটি ঘাঁটিও স্থাপন করে। পলাশী বিপর্যয়ের অনেক আগে থেকেই মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায় তিনটি দুর্গ নির্মাণ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ১৬৯৮ সালে তারা বাদশা আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম কিনে নেয়। এইভাবে এইসব বণিকের দল সমগ্র দেশকে কুক্ষিগত করবার সংকল্প নিয়েই ধীরে অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকে। দেশে থাকতেই ওরা শুনেছিল ভারতে মাটির নীচে আছে মণিমুক্তোর খনি, ভারতের প্রতিটি ধূলিকণায় আছে সোনা। ভারতে এসে তারা দেখল মাটির উপরেই যা পাওয়া যায় তাই দু'হাতে লুট করে নিতে পারলে যথেষ্ট, মনিমুক্তার জন্যে আর মাটির নীচে যাওয়ার দরকার নেই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য উদগ্রীব হল। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি যেমন ফ্রান্স,

জার্মাণী, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, স্পেন, পর্তুগাল এ কাজে অনেক আগেই ব্রতী হয়েছিল। ইংরেজরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবতরণ করে এবং সেখান থেকে দিল্লী গিয়ে ভারত সম্রাটের কাছে নিজেদের আর্জি পেশ করে, আর্জির মূলকথা ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। সম্রাট সানন্দে তা মঞ্জুর করেন। ভাবতেও পারেন নি সেদিন যে এ প্রার্থনা মঞ্জুর করে দেশের কতবড় সর্ব্বনাশের পথ তিনি করে দিলেন। তারপরে ১০০ বছরও পার হল না। পলাশীতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় হল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ জুন। পলাশীর এ বিপর্যয়ের পেছনে ইংরেজের শক্তি ততটা কাজ করে নি যতটা করেছিল তাদের হীন চক্রান্ত। বাণিজ্যের নামে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই যে লুণ্ঠন কার্য্য স্বরু হয়েছিল তা আরো অবাধগতিতে চলল। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে নবাব বানিয়ে ইংরেজই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠল। এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে প্রখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ শ্রীকালিচরণ ঘোষ মন্তব্য করেছেন: "এরপর থেকে ভোজবাজীর মত সব পরিবর্তন ঘটতে লাগল। বিশ্বাসঘাতক ঘৃণ্যজীব মীরজাফর ইংরেজের সাহায্যে নবাব হলেন। জীবনে শান্তি আসে নি। বিদ্রোহ হল মেদিনীপুর, পূর্ণিয়া, বিহারে; তার উপর ইংরেজের হুকুম তামিল করতে প্রাণান্ত। তাদের বিশ্বগ্রাসী অর্থলিপ্সা পূরণ করতে রাজভাণ্ডার শূন্য হল।"

এ প্রসঙ্গে মিঃ উইলিয়ম ডিগবী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, "The Prosperous British India"-য় লিখেছেন "ভারতবাসীর দারিদ্র্যের অন্যান্য কারণের মধ্যে দুটি প্রধান; প্রথম ভারতীয় শিল্পের বিনাশ, দ্বিতীয় ভারতের ধন-শোষণ। আমরা (ইংরেজরা) ভারতবর্ষীয় শিল্পের বিনাশ সাধন করেছি ও ১৮৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত (ইকনমিষ্ট পত্র-সম্পাদকের গণনা অনুসারে) এক হাজার কোটি মুদ্রা ভারতবাসীর নিকট থেকে আদায় করেছি। এই হাজার কোটি টাকা যদি ভারতবর্ষেই থাকত ত শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদে ভারতবাসী কৃষক ও শিল্পীদেরকে ধার দেওয়া যেত; তা হলে তার পরিমাণ সুদসহ এতদিনে পাঁচ হাজার কোটি টাকা হত। ...পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে বিলাতে নগদ প্রায় এক হাজার কোটি মুদ্রা পাঠান হয়েছে।" ভারতবর্ষ থেকে অপরিমিত এই অর্থ লুণ্ঠন সম্পর্কে Brook Adams তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তক "Law of Civilization and Decay"

গ্রন্থে যা লিখেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "Very soon after Plassey the Bengal Plunder began to arrive in London and the effect appears to have been instanteneous, for all authorities agree that the 'industrial revolution', the event which divided the 19th Century from all antecedent time began with the year 1760. Prior to 1760, according to Bavies the machinery used for spinning cotton in Lancashire was almost as simple as India; while about 1750 the English iron industry was in full decline."

এই উদ্ধৃতিগুলি এ কথাই প্রমাণ করে যে পলাশীর পরে যে অবাধ লুণ্ঠন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই লুন্ঠিত অর্থের জোরেই ইংলণ্ড সমগ্র বিশ্বে এত প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের অধিকারী হয়েছে।

এইভাবে নানা অজুহাতে, নানা অছিলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ থেকে যে কত কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছে তার ঠিক নেই। লুণ্ঠিত এই অর্থের দৌলতেই ইংলণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল শিল্প-বিপ্লব: Industrial Revolution যার ফলশ্রুতি সারা ইংরেজ জাতির জীবনে বিচিত্র অগ্রগতি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ বিরাট অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে ইংরেজ দস্যুদলের গড়া East India Company'র দৌলতেই। অনেকে বলে থাকেন ন্যায় নীতি বিসর্জিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই লুণ্ঠন-কার্য্য সমর্থন করে নি ইংলণ্ডের শাসন কর্তৃপক্ষ, আর করে নি বলেই মহাবিদ্রোহের পরে একদিন ইংরেজ রাজশক্তি East India Company'র হাত থেকে ভারতবর্ষকে ক্রয় করে নিয়েছিল। তারা কিন্তু, একবারও ভাবেন না যে ত্রিশ কোটি নরনারী অধ্যুষিত ভারতবর্ষ ইংরেজের কাছে সেদিন পণ্যদ্রব্যের অধিকমূল্য বহন করত না। তাই ক্রয়মূল্য হিসাবে ৮১ কোটি টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়ে ভারতবর্ষ-রূপ পণ্য-সামগ্রীকে ইংলণ্ড সেদিন কিনে নিল। টাকাটা অবশ্য দিতে হল ভারতবর্ষকে। ইংলণ্ডের রাজকোষে হাতটি পর্যন্ত পড়ল না। এমন চমৎকার বিলি-ব্যবস্থার কথা কেউ কোনদিন শুনেছে! ক্রেতা ইংলণ্ড। বিক্রেতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ইংলণ্ডকে ত টাকা দিয়ে মাল কিনতে হবে। তাই কোম্পানীকে ভারতীয় কোষাগার থেকেই ৮১ কোটি টাকা দিয়ে ভারতবর্ষকে ওরা কিনল। সহজ কথা দাঁড়াল এই যে আমরা ৮১ কোটি টাকা দিয়ে আমাদের বন্ধন শৃঙ্খল ক্রয় করলাম।

জাত হিসাবে ইংরেজের মত ধূর্ত জাত পৃথিবীতে আর নেই বললেই চলে। সেই কারণেই ভারত-সাম্রাজ্য দখল করার পর এই সাম্রাজ্য রক্ষার বিবিধ পন্থা ওরা খুঁজে বের করতে লেগে গেল। ভাবল শুধু পশুশক্তির উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের মত ঐতিহ্যমণ্ডিত এত বড় একটা জাতিকে পদানত করে রাখা যাবে না। নতুন পথ বের করতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ হল কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে মানুষকে হীন বল করে তোলা। এই কারণেই দুর্ভিক্ষে যখন দেশের হাজার হাজার লোক মরছে তখনও ওদের লুণ্ঠন চলেছে অব্যাহত গতিতে। শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখেছেন সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, খৃষ্টীয় ১৮৫০ থেকে ১৮৭৫ এই পঁচিশ বছরে বৃটিশ-ভারতে ছয়বার দুর্ভিক্ষ হয়, এবং সেই পঁচিশ বছরে পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র ভারতবাসী অনশনে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের দুর্ভিক্ষ কাহিনী আরো ভয়াবহ। এই পঁচিশ বছরের মধ্যে এদেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে ১৮ বার; আর ঐ দুর্ভিক্ষগুলিতে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে ৬০ লক্ষ ভারতবাসী। এর মধ্যে বিগত ১০ বছরেই মরেছে ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোক।

এ সম্পর্কে মহামতি উইলিয়ম ডিগবী বলেছেন, বিগত ১৭৯৩ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই একশ সাত বছরে সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন যুদ্ধে সবশুদ্ধ ৫০ লক্ষের বেশি লোক নিহত হয় নি, কিন্তু, ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ লোক অনশনে মরেছে। এতে ইংরেজ রাজের বিন্দুমাত্রও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে নি। কেননা, ওরা হিসাব করে দেখেছে যে বিরাট এই ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ৩০ কোটি। এই ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে বছরে যদি ৩ লক্ষ লোক মরেও যায় তবে কার কি ক্ষতি!

ইংরেজরা এসেছে সুপরিকল্পিত পন্থায় ভারতবর্ষের অপরিমিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে। সে-পথ খোলা থাকলেই হোল। ভারতবাসীর মনের উপর আধিপত্য বিস্তার না করতে পারলে ওদেরকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যাবে না, আর তা যদি না পাওয়া যায় তবে ভারতবর্ষ লুণ্ঠনের সব পরিকল্পনাই যে ভেস্তে যাবে। সাধারণ ভারতবাসীর মনটাকে প্রথমে জয় করতে হবে; পরে অন্য কথা। মনটা যদি সত্যি সত্যি জয় করা যায় তবে ওদের দিয়েই আমাদের কাজ আমরা করিয়ে নিতে পারব। ইংরেজীতে দুটি শব্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রচলিত

ছিল : Civilising mission. এই Civilising mission-এর কাজ একদিকে করবে ওদের মিশনারী সম্প্রদায়, অন্যদিকে দেশের নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা। মিশনারীদের কাজ হবে ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে অজ্ঞ, অশিক্ষিত নরনারীর মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করা, আর নতুন শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা সম্ভব হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা, যার ফলে ভারতবর্ষের মধ্যেই একদল ভারতীয় সাহেব সৃষ্টি করা যায়, যারা কথাবার্তায়, চালচলনে, পোষাক-পরিচ্ছদে ইংরেজ না হলেও পুরোপুরি সাহেব তবে ভারতীয় সাহেব। নতুন এই সাহেব দলের ধারণা এই যে, যা কিছু ভারতীয় তাই ঘৃণ্য, সুতরাং বর্জনীয় ; আর যা কিছু ইংরেজের দান তাই মহৎ ; সুতরাং গ্রহণযোগ্য। এইভাবে চলল Civilising mission-এর কাজ অত্যন্ত দ্রুততালে। মানুষ যদি একবার নীচে নামতে শুরু করে তবে তা যে কত দ্রুতগতিতে পারে তা আঁচ করা বড় কঠিন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ কথার প্রমাণ আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বরের ঘোষণা বলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় Civilising mission-এর কাজ। শোষণের কাজ ত কোম্পানীর আমল থেকেই চলে আসছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে সে শোষণ-কার্য্য হল আরো সংহত ; আরো বুদ্ধি-দীপ্ত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর জন্য ইংলণ্ডের কোষাগার থেকে বছরে খরচ হত ৭৫ হাজার টাকা, আর সেই সময় ভারতের বড়লাটের বেতনবাবদ ভারতবর্ষকে খরচ করতে হত বছরে ২,৫০,৮০০ টাকা! এ ছাড়া অন্যান্য কত খাতে যে কতটাকা এদেশ থেকে ইংলণ্ডে চলে যেত তার খোঁজ কে রাখে! এইভাবে ১৮৫৯ সাল থেকে ইংরেজ শাসনের জগদ্দল রথ ভারতবর্ষের উপর দিয়ে চলল, শাসন, শোষণ ও মিশনের পথ ধরে। কিছুদিন পর্যন্ত অবশ্য রথের গতি ছিল অব্যাহত। কিন্তু তাতেও বাধার সৃষ্টি হল।

শাসন ও শোষণের এই বাধা এল বাংলার নীল চাষীদের কাছ থেকে। দেশের গরীব নীল চাষীদের উপর ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ যখন সীমাহীন হয়ে উঠল তখন ঐ সাধারণ মানুষদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল বিদ্রোহের প্রাচীর। সে বিদ্রোহ সাধারণ ধর্মঘটের রূপ পরিগ্রহ করল ১৮৬০ সালে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ক্ষমতা দখলের দু'বছর পার হতে না হতেই। মনে রাখা

দরকার শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে নীলচাষীরা এখানে ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন শুরু করে দেয় বহুবছর আগে থেকেই। ইতিমধ্যে বারাসতের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নীলচাষীদের সম্পর্কে একটি ঘোষণা জারি করেন। সেই ঘোষণার মূল কথাটি ছিল: "নিজ জমিতে নীলচাষ করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন। এইজন্য চাষীদের উপর জোরজুলুম করা বে-আইনী বলে বিবেচিত হবে।" এই ঘোষণা নীলচাষীদের মনে গভীর আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। দলবদ্ধভাবে একক সংগ্রামের একটা সুযোগ এল ওদের কাছে এবং ওরা তা সানন্দে গ্রহণ করল। ১৮৫৯ সালে ওরা সমবেত ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং সেই ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ নীলচাষী একযোগে ধর্মঘট করে। সে-যুগে চাষীদের দ্বারা পরিচালিত এতবড় ধর্মঘট আর হয় নি। গ্রান্ট কমিশনে সেকালের লেফ্‌টান্যান্ট গভর্নর স্যার জন পিটার অকপটে এ কথা স্বীকার করেছেন, বলেছেন এ ধর্মঘট ব্যাপক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। শুধু কি ধর্মঘট? নীলচাষীদের উপর বীভৎস অত্যাচারকে কেন্দ্র করে খ্যাতনামা নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র লিখলেন "নীলদর্পণ"। এই নাটকটি প্রথম ঢাকায় প্রকাশিত হয়, তখন এর কোন নামকরণ হয় নি। নামহীন এই নাটক প্রথম রাত্রিতেই ঢাকা শহরে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করে তা তুলনাহীন। পাদ্রী জেমস লঙ এই নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন। ইংরেজী নীলদর্পণ নাটক পাঠ করে শুধু নীলকরগণই নন, বাংলার সমগ্র ইংরেজ সমাজই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ইংলিশম্যান ত লঙের বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করে দিল। বিচারে তার একমাস জেল ও এক হাজার টাকার জরিমানা হল। জরিমানার টাকা দিয়ে দিলেন কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুকুমার রায়ের মতে নীল আন্দোলনই ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক অভিযান।

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও নীল-বিদ্রোহ

'নীল-বিদ্রোহ'কে কে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবেন জানা নেই; তবে একথা ঠিক যে এই বিদ্রোহের সূচনা, গতি ও পরিণামের মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। নীলচাষীদের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এবং শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের স্বার্থ রক্ষা করতে ওরা যে-ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল ওদের

প্রতিরোধ করতে আমাদেরও তেমনি নিজেদের, সব বাদবিসম্বাদ ভুলে এক হতে হবে; এই ধারণার মধ্যেই জাতীয়তাবোধের উৎস।

সে-যুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই শত্রুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ অভিযানের পথ আমাদের দেখিয়েছেন। পত্র-পত্রিকাগুলির নব-জাগরণের এই নতুন ভূমিকা ভারতের জনসাধারণের উপর প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করেছে। এতে ভীত হয়ে পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধ করবার উদ্দেশ্যে লর্ড লিটন এক নতুন অর্ডিন্যান্স (Press ordinance) জারি করলেন। ১৮৭৬-৭৭ সালে প্রায় ১৫টি পত্রিকার প্রবন্ধের অংশ বিশেষের উল্লেখ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে প্রবন্ধগুলি সিডিশাস্। এই সংবাদপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল সমাজ দর্পণ, প্রতিকার, বিশ্বদূত, ঢাকাপ্রকাশ ও সোমপ্রকাশের।

এইত গেল তদানীন্তন পত্র-পত্রিকাগুলির কথা। ইংলণ্ডের সর্বগ্রাসী আন্দোলন প্রতিরোধ করতে এবার এগিয়ে এল হিন্দুমেলা বা চৈত্রমেলা। শ্রীনবগোপাল মিত্র এর প্রবর্তক। তাঁরই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলার যাত্রা শুরু। ১৮৬৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এর প্রথম আবির্ভাব বলে একে কেউ কেউ চৈত্রমেলা বলেও অভিহিত করেছেন। এই মেলার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালী তথা সমগ্র ভারতবাসীর জাতীয় শিল্পকলা ও সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত ও কাব্যপ্রবাহ, কৃষি, মল্লবিদ্যা প্রভৃতি গুণাবলীর একত্র সমাবেশ করে তারই মাধ্যমে স্বদেশের পরিপূর্ণ ভাবমূর্ত্তিকে পরিস্ফুট করে তোলা। পরমুখাপেক্ষিতা নয়, অন্ধ অনুকরণ নয়, পরনির্ভরতা নয়। নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের আত্মসম্বিতকে আবার আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এই অনুভূতি আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে এগিয়ে এসেছেন রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রমুখ মনীষিবৃন্দ। সারা উনবিংশ শতাব্দী মুখর হয়ে উঠেছিল তাঁদের জীবনের জয়গানে। ইংরেজের দাপটে একদিকে যেমন গোটা উনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের পক্ষে অভিশাপ ঠিক তেমনি আবার আশীর্ব্বাদও। এই যুগে নব-জীবনের মন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করেছেন রাজা রামমোহন (১৭৭২—১৮৩৩) ধর্মসংস্কারের পথেই তাঁর প্রথম দুঃসাহসিক অভিযান সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাধীনতা যে মানুষের জন্মগত অধিকার একথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কথাতেই বলি: "It is impossible for a thinking

man not to feel the evils of Political subjection and dependence upon foreign people."

আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম মন্ত্র

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে তার রচিত 'আনন্দমঠ' বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের বিপ্লব-আন্দোলনে যে উন্মাদনা ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা কোথায়! আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় দেখি: সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে, সেই গহন অরণ্যানির মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠ শোনা গেল: "আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?"

"তোমার পণ কি?" "পণ আমার জীবন সর্বস্ব।" "জীবন তুচ্ছ, সকলেই দান করিতে পারে।" এত সাধারণ অথচ এমন অসাধারণ কথা ত কেউ কোনদিন বলেন নি। বহুবর্ষ পরে রবীন্দ্রনাথ ঐ একই কথা বলেছেন:

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।"

আর এই বাণীকে রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লিখে রেখে গেছেন ভারতের বিপ্লবী মহানায়ক সূর্যসেন। সূর্যসেনের ১৯৩০ সালের যুববিদ্রোহের যদি কোন উদ্দেশ্য থেকে থাকে তবে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে তার Death Programme-এর মাধ্যমে। আর সে Death Programme-এর মর্মবাণী হচ্ছে: "জীবন তুচ্ছ, সকলেই দান করিতে পারে"—এই কথাটি সমগ্র জাতিকে শিখিয়ে দেওয়া।

যে কথা-প্রসঙ্গে এই বক্তব্য সেই কথাতেই আবার আমরা ফিরে যাব। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ও আনন্দমঠ। "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মৃন্ময়ী ভূমিকে চিন্ময়ী মহাশক্তিরূপে দর্শন করে রচনা করেছিলেন—মহামন্ত্র, 'বন্দেমাতরম্'। এই সঙ্গীতই ছিল ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের বৈদ্যুতিক শক্তি-সঞ্চারী মঙ্গলমন্ত্র।" আনন্দমঠের রচনাকাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। 'বন্দেমাতরম্' রচিত হয় আরো আগে। তবে আনন্দমঠের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই 'বন্দেমাতরম' এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

আনন্দমঠেই বাঙালীর কাছে স্বদেশ মাতৃমূর্তিরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠল। ভবানন্দের কণ্ঠে সে শুনতে পেল: "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা অন্য মা মানি না, আমরা বলি জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের কাছে কেবল সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মা—"। এর পরে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বললেন, 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষিতা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত, জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।……ভুলিও না, নীচজাতি মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

মনে রাখতে হবে যে প্রথম জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ নিজে ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। এই বিপ্লবকে কার্যকর করে তুলতে চেষ্টাও যথেষ্ট করেছেন, সফল হতে পারেন নি। শুধু কি তাই! বিপ্লবী মহানায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর "মুক্তিসঙ্ঘ" গঠনের আগে একবার ঢাকাতে গিয়েছিলেন স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। হেমচন্দ্র বিপ্লব-পথের জনৈক পথিক এ কথা জানতে পেরে তিনি তাঁকে বলেন, "পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নেই, তোদের একমাত্র কাজ শক্তি সঞ্চয় করে পরস্বাপহারীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া।" স্বামী বিবেকানন্দের এ আশীর্বাণী বহন করেই সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন হেমচন্দ্র। সে বাণীকে সার্থক করে তুলতে আজীবন অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। বিপ্লবী মহানায়ক সূর্যসেনের যে যুববিদ্রোহ তাতেও স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজ-বিতাড়নের বাণী বাস্তবে রূপায়িত।

মৃত্যুর আহ্বান

'মৃত্যুর আহ্বান' স্বামীজির কণ্ঠে শুনে মৃত্যুর ভয়ে কে বসে থাকতে পারে ঘরে?

সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর আহ্বানের মধ্যেই মাষ্টারদার মৃত্যুর কর্মসূচীর উৎস। মৃত্যুর কর্মসূচী না থাকলে ত অচল হয়ে যাবে দেশ। কেননা এই কর্মসূচীর মধ্য দিয়েই ত স্বাধীনতা লাভের কর্মসূচী, মনুষ্যত্ব অর্জনের কর্মসূচী। তাই সেই একই কথা শুনলাম বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ও স্বামীজীর কণ্ঠে এঁদের কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই বাণীই সূর্যসেন রক্তের অক্ষরে লিখে রেখে গেলেন পথে ও প্রান্তরে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ভারত-সঙ্গীত। ১৮৭০ সালে, অর্থাৎ আনন্দমঠেরও ১২ বছর আগে। কিন্তু সেই সঙ্গীতের মূর্ছনা যেন আজও শোনা যায়।

আরব, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য আর কব কি—
চীন, ব্রহ্মদেশ, সুদূর জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

ছোট, বড় দুনিয়ার সমগ্র জাতিই স্বাধীন, আর পেছনে পড়ে থাকবে শুধু ভারতবর্ষ? সুপ্ত ভারতবাসীর ঘুম ভাঙাবার জন্য, বুকে তাদের সাহস যোগাবার জন্য কবি শোনাচ্ছেন তাদের, দেশের অতীত ইতিহাস।

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে
রণরঙ্গমত্ত পূর্ব্বপিতৃগণ,
যখন তাহারা করেছিল রণ
করেছিল জয় পঞ্চনদগণ
তখন তাহারা ক'জন ছিল?

অতীতে যে যুদ্ধ বিগ্রহ করেছেন, বর্ত্তমান ভারতবাসীর পিতৃপুরুষেরা তখন ত জনবল তাদের বেশি ছিল না। তবে ?

এখন ত তাদের চেয়ে অনেক বেশী তোমাদের লোকজন তবু এই দুর্দশা কেন ?

এখন তোরা যে শতকোটি তার
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন ছাড় !

শুধু একবার উঠে দাঁড়াতে হবে, অস্ত্র নিতে হবে হাতে। বসে থাকলে চলবে না।

জপ, তপ, আর যোগ-আরাধনা
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূনীর কৃপাণ কর রে পূজা।

ওঠ, জপ তপ আর নয়, আর নয় পূজা হোম যাগ। পূজা যদি করতে হয় তবে, তূনীর কৃপাণকে পূজা কর। ভারতবর্ষের সেই অতীতের কথা ভুলে যাও, যখন তপস্যা দ্বারাই অনেক কিছু করা যেত।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কর্ম্ম সিদ্ধি হত এ মহীমণ্ডলে···

এখন এ সবে হবে না কিছু। কিসে হবে তবে ? পরিষ্কার উত্তর—হবে না, হবে না, খোল তরবার ! কেন ? এ সব দৈত্য নহে তেমন। তাই, ভীরুতা পরিত্যাগ কর।

"অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ
রণ-রঙ্গ-রসে হওরে উন্মদ"

তবেই বিরুদ্ধ শক্তিকে পর্যুদস্ত করা সম্ভবপর হবে। জাগরণীর এ গানের রেশ কি কোনদিন ভুলতে পারবে দেশবাসী ? রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-বন্দনা ত তুলনাহীন।

নব বৎসরের প্রথম প্রভাতে প্রভাত সূর্য্যের দিকে চেয়ে যে বালক বলে ওঠে—

নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে তোমার চরণে
হে-ভারত, লব শিক্ষা।

তার প্রার্থনা কি কোনদিন অপূর্ণ থাকে! নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনায় কবি প্রার্থীকে এই বলে আশীর্ব্বাদ করেছেন:

চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার
সেত নহে সুখ ওরে সে নহে বিশ্রাম
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা, দ্বারে দ্বারে পাবি মানা।
এই তোর নব-বৎসরের আশীর্ব্বাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।
ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি, তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।

শুধু কবিতা নয়, গান ও প্রবন্ধেও তিনি জীবনের এই অনুরণন অব্যাহত রেখেছেন। এই মনিষীদের উদাত্ত আহ্বানেই ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে ঘুম ভেঙ্গেছে সুপ্ত ভারতবাসীর।

পত্র-পত্রিকার প্রভাব

মানসিক প্রস্তুতির এই নব-অভিযানে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রভাবও লক্ষণীয়। এই সব পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেক। মাত্র কয়েকটি কথা এখানে বলছি। প্রথমেই মনে পড়ে শিশির কুমার ঘোষ সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকার নাম। বাঙলায় অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে এর প্রথম প্রকাশ ১৮৬৮ সালে যশোহরে, ১৮৭১ সাল হতে

ইংরেজিতে কলকাতা থেকে এই পত্রিকাটি দৈনিক বের হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ও অগ্রগতিতে এই পত্রিকার অবদান উল্লেখযোগ্য।

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বের হয় মাসিক বঙ্গদর্শন। এই পত্রিকাখানি সে-কালে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল।

এর পরেই নাম করতে হয় সঞ্জীবনী পত্রিকার। কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় জাগরণের খোরাক যুগিয়ে এই পত্রিকাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে। প্রায় একই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচার' ও অক্ষয় কুমার মৈত্রের 'নব-জীবন' প্রকাশিত হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সব পত্র-পত্রিকা দেশের জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতা অর্জনের পথকে প্রশস্ত করেছিল। শুধু প্রশস্তই করেনি দুঃসাহসে ভরে তুলেছিল। এদের মধ্যে ছিল যুগান্তর, সন্ধ্যা, কলকাতার বন্দেমাতরম্, সুপ্রভাত ও কর্মযোগিন্। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে এই পত্র পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয় এবং সারা দেশে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে আরো দুটি পত্রিকার নাম করতে হয় যাদের প্রকাশকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হলেও সমগ্র দেশের বিপ্লব আন্দোলনে এদের অবদান অনস্বীকার্য। পত্রিকা দুটি, কেশরী ও মারহাটা। বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন এদের পরিচালক। কলকাতা থেকে প্রকাশিত বন্দেমাতরম্ ও কর্মযোগিন্ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অরবিন্দ। তিলক ও অরবিন্দের জন্যই 'কেশরী' এবং 'মারাঠা', 'বন্দেমাতরম্' ও কর্মযোগীন্ সারা দেশে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

শুধু পত্র-পত্রিকাগুলিই নয়, দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল সে-যুগে প্রকাশিত এমন কয়েকটি পুস্তকের নাম না করলে এ-কাহিনী থাকবে অসম্পূর্ণ। বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরির কাজে এদের অবদানও কম নয়। 'আনন্দমঠের' উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেই করা হয়েছে। এর পরের সারিতে আছে ভবানীমন্দির 'দেশের কথা', বর্তমান রণনীতি, মুক্তি কোন পথে, শিখের বলিদান, গ্যারিবলডি ও ম্যাটসিনির জীবন বৃত্তান্ত, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত প্রভৃতি গ্রন্থ।

এই ত গেল ভাব-বিপ্লবের কথা। ভাব-বিপ্লবের পরেই বাস্তব-বিপ্লব। ইতিহাসের এইত গতি-পথ। এই পথেই ফরাসী বিপ্লব এগিয়ে গেছে। এই পথেই সংঘটিত হয়েছে রুশ-বিপ্লব, সার্থকতা লাভ করেছে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভারতবর্ষ এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না—হয়-ও নি। বিপ্লব-প্রচেষ্টায় দেহের খোরাক যতখানি প্রয়োজন ঠিক ততখানি প্রয়োজন মনের খোরাক। বিপ্লবের পথ-যাত্রীর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা একথা বলে দেবে দেশের মন অর্থাৎ দেশের সাহিত্য। টেরেন্স ম্যাকসুইনির ভাষায়:

"A nation's literature is an index to its mind. If the nation has its will to win, from its literature we learn if it is half-hearted, or if it cares not at all. Whatever state prevails passionate men can pour their passion through literature to the nation's sole and make (it) burn, and move and fight. For this reason it is of transcendent importance to the cause. Literature is the shrine of freedom, its fortress, its banner, its charter. In its great temple patriots worship, from it soldiers go forth, wave its challenge and fight, and conquering write the charter of their country."

(T. Macswinoy : Principles of Freedom)

টেরেন্স ম্যাকসুইনির একথা ভারতবর্ষের নব-জাগরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের সাহিত্যই দেশবাসীর ঘুম ভাঙিয়েছে, এদেশের সাহিত্যই তার আত্মসম্বিত ফিরিয়ে এনেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। মারাঠা তখন আবার অগ্নিগর্ভ। শিবাজীর জন্মভূমি মহারাষ্ট্র ত কোনদিনই বসে থাকতে জানে না। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহেও তাই এগিয়ে এসেছিলেন মারাঠার বীর সন্তানেরা। এর ২০ বছর পরে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন মহারাষ্ট্রের আর এক বীর সন্তান বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। অটুট মনোবল ছাড়া তার আর সম্বল ছিল না কিছু। না অর্থ, না সৈন্য। তবু পিছু হটবার পাত্র নন ফাড়কে। দেশের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরতে লাগলেন তিনি। শিবাজীর নামে আহ্বান জানালেন মারাঠার তরুণদের। ইংরেজ বিতাড়নের আহ্বান,

স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ে তোলবার আহ্বান। অশান্ত, অরণ্যচারী তরুণ মারহাটাদের নিয়ে গড়ে- তুললেন দুঃসাহসিক এক সেনাদল। ১৮৭৯ সালে এই ফাড়কে বাহিনী গ্রামে গ্রামে বৃটিশসৈন্যের নির্মীয়মান ঘাঁটির উপর রাত্রির অন্ধকারে আকস্মিক আক্রমণ চালায়, বহুসৈন্য বিধ্বস্ত হয়। ইংরেজ সৈন্য পর্যুদস্ত হতে থাকে। এগিয়ে চলেন ফাড়কে তাঁর গেরিলা বাহিনী নিয়ে। অকস্মাৎ একদিন ইংরেজ সেনারা খবর পেল যে ফাড়কে ও তাঁর কিছু সাঙ্গপাঙ্গ আশ্রয় নিয়েছেন হায়দ্রাবাদের এক দেবমন্দিরে। মন্দির অবরোধ করে বীর ফাড়কেকে শত্রুসেনারা গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগের আদেশ হয়। দেশের বাইরে সুদূর এডেনের নির্জন কারাকক্ষে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। প্রায় চার বছর পাশবিক উৎপীড়ন সহ্য করে এডেনের সেই কারাকক্ষেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ১৮৭৯ সালে ফাড়কের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই মারহাটার সেদিনকার স্বাধীনতা সংগ্রাম কিছুদিনের জন্য বন্ধ হল বটে, কিন্তু চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হল না মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীশক্তি। রাতের অন্ধকারে, লোকচক্ষুর অন্তরালে আবার শুরু হল প্রস্তুতিপর্ব। ফাড়কের মৃত্যুর পরে মাত্র ১৪টি বছর গেল। ১৮৯৭ সালে আবার আঘাত হানল মহারাষ্ট্র। স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মবিসর্জন করে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রইলেন মহারাষ্ট্রের চাপেকার ভ্রাতৃত্রয়—দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেব। এদের পদভরে আবার কেঁপে উঠল মারাঠা। সারা অঙ্গে তখন তার সর্বনাশের নেশা।

অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তরদল

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে মারাঠারা যখন ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানল তখন বাঙালীও ঘরে বসে ছিল না। তখন বাংলা বিপ্লবী দল গঠনে ব্যস্ত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই স্থাপিত হল অনুশীলন সমিতি ব্যারিষ্টার পি, মিত্র ও সরলা দেবীর নেতৃত্বে। কয়েকটি ব্যায়ামাগারের মাধ্যমে শুরু হল সমিতির মানুষ গড়ার পালা। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সমিতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। বিপ্লবমন্ত্রে দেশের তরুণদের দীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হলেও প্রথমে তা ছিল শুধু ব্যায়াম চর্চার আখড়া। শুধু কলকাতায় নয় দেশের অন্যত্রও অনুশীলন সমিতির শাখাপ্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হল।

ইতিমধ্যে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দেই অরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠালেন কলকাতায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার কাজে। যতীন্দ্রনাথ এসে দেখলেন জমি একেবারে তৈরী। শুধু বীজ বপনের অপেক্ষা। সর্ব্বপ্রথমে তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার কাছেই ব্যায়াম চর্চ্চার একটি আখড়া স্থাপন করেন। কিন্তু, ব্যায়াম চর্চা ছিল এই আখড়ার বাইরের রূপ। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেছে বেছে আখড়ার সভ্যদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করা। কাজ এগিয়ে চলল। ব্যারিষ্টার পি, মিত্র ও সরলা দেবী অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙলার বিপ্লব-মন্ত্র প্রচারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ বাঙলায় এসেই অরবিন্দের নির্দেশক্রমে সর্বপ্রথমে সরলাদেবী ও পরে পি, মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশে বিশেষকরে কলকাতায় গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার কাজ এইভাবে শুরু হয়।

বাঙলায় গুপ্তসমিতি গঠনের চিন্তা অরবিন্দকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি। যতীন্দ্রনাথকে বাঙলায় পাঠিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত নন। ছ'মাস যেতে না যেতেই তাই ডাক পড়ল বারীন্দ্রের। তাঁকেও ঐ একই কাজে বাঙলায় পাঠান হল। এর কিছুদিন পরে সবকিছু নিজের চোখে দেখবার ইচ্ছায় নিজেই চলে এলেন বাঙলায়। এসে খুশি হলেন দেখে যে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এখন শুধু সরলাদেবী ও পি, মিত্র প্রতিষ্ঠিত ব্যায়াম চর্চার কেন্দ্রগুলিকে ঢেলে সাজাতে হবে। এই কাজে বাধা এল সকলের আগে সরলাদেবীর কাছ থেকে। তিনি ছিলেন গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার বিরোধী। সেই কারণেই গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার কাজ যত এগিয়ে চলল সরলাদেবীও তত পিছিয়ে পড়লেন। পি, মিত্র তখনও অনুশীলন সমিতির সভাপতি। সভাপতি হিসাবেই তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা গমন করেন এবং সেখানে পুলিন বিহারী দাসের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির একটি শক্তিশালী শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সমিতি ঢাকা অনুশীলন সমিতি নামে পরিচিত হলেও কালক্রমে এই প্রতিষ্ঠানই অনুশীলন সমিতির সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে।

সরলাদেবীর পশ্চাদপসরণের কথা বলা হয়েছে, এবার পি, মিত্রের কথা। প্রখ্যাত গ্রন্থকার কালিচরণ ঘোষ তাঁর 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' গ্রন্থে লিখেছেন, "উগ্র মতামত যারা পোষণ করত, তারা ধীরে ধীরে অরবিন্দের পরামর্শ, সাহচর্য্য খুঁজতে শুরু করে দেওয়ায় মূল সংস্থায় একটা চিড় খেয়ে গেল। মিত্র মহাশয়

দেখলেন যে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একক কর্তৃত্ব তার হাত থেকে সরে যাচ্ছে। অতটা মারমুখী হয়ে ওঁদের মত মন গড়ে তুলতে না পারায়, তিনি পরিচালক থাকলেও তাঁর অনুশীলনের আদি সভ্যদের কাছেও একটু পেছনে সরে গেলেন।

তারপর হল কার্যধারা নিয়ে মতভেদ। তখন দলের যুবকদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। যারা অরবিন্দ-ভক্ত, তারা কোন বড় বাধা পেল না। তিনি প্রকাশ্যে উৎসাহ না দিলেও পরের অর্থ লুণ্ঠনের ব্যাপারে তাঁর যে খুব বড় আপত্তি নেই সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।......

এখন অনুশীলনের যুবকদল মনে করতে আরম্ভ করে যে, তাদের উপর ভীরুতার অপবাদ এসে পড়ছে। সুতরাং তারাও কতকটা এগিয়ে পড়তে লাগল। বিশেষ করে ঢাকা অনুশীলন সমিতির পক্ষে আর অলস হয়ে বসে থাকা চলছিল না। তাদের বিবিধ ব্যায়ামের প্রয়োগ-ক্ষেত্র চাই। কিছু কিছু গোলযোগের খবর কলকাতায় আসতে লাগল। এই সময় কলকাতার অনুশীলন সমিতি নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।"

পি, মিত্র তখনও নামে সভাপতি। দলের মধ্যে যারা পি, মিত্রের এই নরম পন্থার শিকার না হতে চাইলেন তাঁদের সঙ্গে পি. মিত্রের বিচ্ছেদ অনিবার্য্য হয়ে উঠল। এই বিরোধী দলের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্র দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরাই ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এঁদেরকে কেন্দ্র করেই মূল অনুশীলন সমিতিতে একটি বিরোধী দল জন্মলাভ করল এবং এঁরা যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলেই 'যুগান্তর' দল নামে পরিচিত হলেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেছেন : "যুগান্তর পত্রিকাকে ঘিরে পরোক্ষে অরবিন্দ এবং প্রত্যক্ষে যে-দল গড়ে উঠলো, তার বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় কতকগুলি সাহসিকতাপূর্ণ, বিপজ্জনক ও নাম-করা কাজের মধ্য দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আলিপুর বোমার মামলা এবং তার মধ্যে নরেন গোঁসাই নিপাত পর্ব্ব যুগান্তরদলের প্রতিষ্ঠা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন প্রমুখ ব্যক্তিরা দলকে আরও সম্ভ্রম-যুক্ত করে তোলেন।"

ভারতবর্ষের বিপ্লব-আন্দোলনে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দুটি পাশাপাশি নাম। তার আগে ও পরে ছোট ছোট অনেক দলের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই দলগুলির মধ্যে অনুশীলন সমিতির সৃষ্টিই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষের সশস্ত্র বিপ্লবে এদের দানও অসামান্য। যুগান্তর দলের সৃষ্টি

কয়েক বছর পরে হলেও বিপ্লবের হোমানলে এদের আহুতিও সর্বজনস্বীকৃত। ছোট ছোট বিপ্লবী দলগুলির বিপ্লব-প্রচেষ্টাও বিস্ময়কর। এদের মধ্যে আছে কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি (১৮৯৭), ময়মনসিংহের সুহৃৎ সমিতি (১৯০১), গোন্দলপাড়া বান্ধব সম্মিলনী, ঢাকার মুক্তি সঙ্ঘ (১৯০৫), বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি (১৯০৫), ফরিদপুরের ব্রতীসমিতি (১৯০৬), মাদারিপুরের শান্তি সেনা প্রভৃতি।

বঙ্গভঙ্গ

আমরা দেখলাম কিভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সমগ্রদেশ বিশেষ করে বাঙলা, প্রস্তুত হতে লাগল আগামীদিনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য। শুধু ভাবজগতে নয়, বিপ্লবপথের জয়যাত্রায় এগিয়ে চলল দেশের নর-নারী। ঠিক এই সময়ে এল বঙ্গভঙ্গ। বারুদের স্তূপে লাগল অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ—দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আর কোন ঘটনা দেশের এতকালের জড়তা এত সহজে দূর করে জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধকে এমনভাবে জাগ্রত করতে পারত না।

১৯০৫ সাল। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন। বেশ কয়েক বছর ধরেই বৃটিশ সরকার একথা উপলব্ধি করেছিল যে সারা ভারতবর্ষে বৃটিশ-বিরোধী যে মনোভাব দানা বেঁধে উঠেছে বাঙলাই তার প্রাণকেন্দ্র, সুতরাং ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে চাইলে প্রথমে আঘাত হানতে হবে বাঙলায়। বাঙলাকে দুর্বল করতে পারলে সারা ভারতবর্ষকে হীনবল করা সহজ হবে। সাম্রাজ্যবাদের এই অভিসন্ধিকে কাজে পরিণত করার ভার পড়ল লর্ড কার্জনের উপর। লর্ড কার্জন ভারতে প্রবেশ করার পরে দেখলেন বাঙলাকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে কোনদিন সে আর ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। এর একমাত্র পথ বাঙলাকে দুইভাগে ভাগ করে ফেলা। ভারতসচিবকে জানান হল বাঙলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বাঙলাদেশের আয়তন এত বিশাল যে একজন শাসনকর্তার পক্ষে এতবড় একটি প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব। তাই বাঙলাকে দুইভাগে ভাগ করতে হবে। এটা অবশ্য ধূর্ত ইংরেজ জাতির বাইরের কথা, আসল কথা বাঙলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে বাঙালী জাতিকে তথা সমগ্র ভারতবর্ষকেই দুর্বল করে তোলা। সরকারের

এই মনোভাবকে কার্যে পরিণত করতে বিলম্ব ঘটল না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর এক ঘোষণাপত্রে বৃটিশ সরকার জনসমক্ষে বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাবের খসড়া পেশ করল। দেড় মাস পরে ১৬ই অক্টোবর তা কার্যকরী হল। এই প্রস্তাবমত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সব কয়টি জেলা ও রাজসাহী বিভাগের রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদহ জেলা যুক্ত হল আসামের সঙ্গে। রাজধানী ঢাকা। নতুন এই প্রদেশের নাম হল পূর্ববঙ্গ ও আসাম। বাঙলার বাকি ক'টি জেলা যুক্ত হবে বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে। এর রাজধানী কলকাতা। বৃটিশ সরকার এইভাবে তার মনোবাঞ্ছা পূরণের কাজে এগিয়ে চলল। এদিকে বাঙলার সভাসমিতিতে উঠল প্রতিবাদের ঝড়। ঘরে ঘরে বেজে উঠল রণ-দামামা। ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন সবাই: রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সবাই। চরমপন্থী ও নরমপন্থীর মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গেল চূর্ণ হয়ে। সকলেই আজ একপন্থী।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর যেমন বৃটিশ সরকারের সদম্ভ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিন, ঠিক তেমনি আবার বাঙালীর সঙ্কল্প গ্রহণের দিন। ঐদিন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় বাঙালী করল রাখীবন্ধন উৎসব। গান উঠল আকাশে—

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন্
এক হউক, এক হউক, এক হউক,
হে ভগবান্।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাব অনুসারে ঘরে ঘরে পালিত হল অরন্ধন পর্ব। একটি উনানও ধরল না, একটু আগুনও জ্বলল না। এই রাখি-বন্ধন ও অরন্ধনের মধ্য দিয়ে বাঙালী তার অটুট সঙ্কল্প ঘোষণা করল। যতদিন বাঙলা থাকবে খণ্ডিত ততদিন এ সংগ্রামের শেষ নেই। "The Partition of Bengal is a settled fact"—বলেছিল সদম্ভ বিদেশী রাজশক্তি। এই settled fact-কে unsettled করব আমরা—এই হল বাঙালীর সঙ্কল্প।

প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠল সারা বাঙলায়। স্বদেশী, বয়কট ও পিকেটিং এই ত্রিধারায় উদ্বেল হয়ে উঠল বাঙলার নরনারী। এক বছর দু'বছর নয়, পুরো ৬টি বছর চলল এ সংগ্রাম। অনন্যোপায় হয়ে সরকার পাশবিক দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করল। "বেত মেরে, আগুনে দগ্ধ করে,

কারাগর্ভে নিক্ষেপ করে, হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়ে, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে, পাইকারী জরিমানার আঘাত দিয়ে এই আন্দোলনকে বৃটিশরাজ থামাতে পারল না।" শেষকালে ৬ বছর পরে বৃটিশ সরকার বাঙালীর সম্মিলিত জাগ্রত শক্তির কাছে নতি স্বীকার করল। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কাজে পরিণত হয় ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, আর ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তা রদ করা হয়।

দীর্ঘ ছ'বছরের এই সংগ্রামে জনসাধারণ ও জননেতারা যে সঙ্কল্প সাধনা ও সর্বস্ব ত্যাগের পথ দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে অন্তপ্রেরণার সঞ্চার করেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জনসাধারণ কিভাবে এগিয়ে এসেছেন তা আমরা জানি। কিন্তু যে কথাটা আমরা জানি না সেটা হচ্ছে এই যে এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন বাঙলার বিপ্লবীরা। প্রতিরোধ আন্দোলনের পেছনে বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মধারাও চলেছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। নায়কেরা একথা জানতেন যে বঙ্গভঙ্গ একদিন না একদিন রদ হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে বন্ধ হবে এই প্রতিরোধ আন্দোলন। কিন্তু, বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা ত বন্ধ হয়ে যাবে না। ভারতবর্ষ যতদিন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করবে ততদিন বিপ্লব প্রচেষ্টার শেষ নেই। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন চলছিল তখন ত বটেই, তারপরেও বাঙলায় তথা সমগ্র ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টা চলছিল অব্যাহত গতিতে।

বঙ্গভঙ্গ বনাম বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দমন করতে গিয়ে যে চণ্ডনীতির আশ্রয় সরকার গ্রহণ করেছেন সেই চণ্ডনীতির প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্যই বাঙলার গুপ্তসমিতিগুলির জন্ম। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত খ্যাতনামা ঐতিহাসিকও এই মতের সমর্থক। এ কথা যে সত্য নয় তার প্রমাণ এই যে বাঙলায় গুপ্তসমিতি গঠিত হয় বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকেই। তখন কোথায় বঙ্গভঙ্গ? আসল কথাটা এই যে সরকারের চণ্ডনীতি গুপ্তসমিতি প্রসারের পথকে সহজ করে দিয়েছে; কিন্তু তাই বলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই গুপ্ত-সমিতির জন্মদাতা এ কথা বললে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হবে।

কিংসফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টা

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদ করবার সঙ্গে সঙ্গেই; কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠল। পশ্চিমবঙ্গে এই আয়োজন আত্মপ্রকাশ করল কলকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড সাহেবের হত্যা প্রচেষ্টায়।

কুখ্যাত এই কিংসফোর্ড সাহেব ছিলেন অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। রাজনৈতিক মামলার নামগন্ধ শুনলেই তার কর্মতৎপরতা একেবারে তুঙ্গে উঠত। ১৯০৭ সালে ইনি দেশবরেণ্য নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে রাজদ্রোহের একটি মামলায় আদালত অবমাননার দায়ে ৬ মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ঘটনাটা সামান্যই। 'বন্দেমাতরম্' কাগজ তখন বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের হৃদয় জয় করেছে। বন্দেমাতরমের লেখাগুলিতে লেখকের নাম থাকত না। তবে প্রবন্ধের অধিকাংশই যে অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তা ছাড়া বিপিনচন্দ্র বন্দেমাতরমের সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন বলে পুলিশের ধারণা। কিন্তু ছাপার অক্ষরে নাম ছিল না বলে কিছু করা যাচ্ছিল না। উপায়ন্তর না দেখে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড তাঁকে এই মামলার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তলব করলেন। বিপিনচন্দ্র সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন না। একটা চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দিলেন, বললেন, ন্যায় ও নীতি বিরোধী এই আদালতকে তিনি মানেন না। বিবৃতি শুনে স্তম্ভিত হল সবাই। আদালত অবমাননার দায়ে তার ৬মাস জেল হল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে তিনি কিংসফোর্ড সাহেবের এই আদেশকে অভিনন্দন জানালেন। আদালত ও আদালতের বাইরে সেদিন লোকে লোকারণ্য। জনতাও ঘন ঘন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে তাদের প্রিয় নেতাকে অভিনন্দিত করল। পুলিশের কাছে এ আচরণ অসহ্য। তারা লাঠি-চার্জ করল। শুরু হল জনতা ও পুলিশের লড়াই। লাঠি নিয়ে, ব্যাটন নিয়ে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র জনতার উপর। কারও হাত পা ভাঙল, কারও বা ফাটল মাথা, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, তবু মারের বিরাম নেই। নীরবে এই উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে এগিয়ে এলেন ১৫ বছরের এক তরুণ। চোখে মুখে তার অমর জ্যোতির লেখা। এক

ঘুষিতে অনেক স্থূলদেহী পুলিশকে সে ধরাশায়ী করে ফেলল। এত স্পর্দ্ধা? বন্দী হল কিশোর পুলিশের হাতে। পরের দিন আবার বিচার ঐ কিংসফোর্ড এর কোর্টেই। দণ্ড, ১৫ ঘা বেত। বেত্রাঘাত শুরু হল, শেষও হল। হাসিমুখে স্থশীল তা সহ্য করলেন। পথে পথে ধ্বনিত হল গান: 'বেত মেরে কি মা ভোলাবে, আমরা কি মা'র সেই ছেলে?' পরের দিন, ১৯০৭ সালের ২৮শে আগষ্ট, কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় স্থশীলচন্দ্রকে তাঁর বীর্যমত্তার জন্য বৈপ্লবিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হল।

শুধু এইখানেই শেষ নয়। বিপ্লবী বাঙলা সেদিন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবের মূল কথা এই যে এই অমানুষিক বিচারের জন্য কিংসফোর্ড সাহেবকে তার ন্যায্য পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে।

ইংরেজ সরকারও কিংসফোর্ডকে নিয়ে চিন্তিত। নিরাপত্তার খাতিরে ওঁকে কলকাতা থেকে মুজঃফরপুরে বদলী করা হল। জায়গাটা কলকাতার বাইরে কিন্তু, বিপ্লবী বাঙলার দৃষ্টিপথের বাইরে নয়। মুজঃফরপুর-বদলীর খবর পেয়ে সেখানেই তার পশ্চাদ্ধাবন করার ব্যবস্থা করলেন বিপ্লবী নেতৃত্ব। কিছুদিনের মধ্যেই কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সঙ্কল্প নিয়ে মুজঃফরপুরে হাজির হলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। ১৯০৮ সাল, এপ্রিল মাস প্রায় শেষ। ওঁদের ইচ্ছা এপ্রিল মাসের মধ্যেই কিংসফোর্ডকে যমালয়ে পাঠিয়ে ওঁরা বীরের মৃত্যু বরণ করবেন। মুজঃফরপুরে এক ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন তাঁরা। কয়েকদিনের মধ্যেই একদিন খোঁজ পেলেন রাত্রিতে ইউরোপীয়ান ক্লাবঘরে বসে তাস খেলছেন মিঃ কিংসফোর্ড। তৈরী হয়ে ক্লাবঘরের কাছে ওত পেতে রইলেন বাঙলার দুই সিংহশিশু, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। প্রায় রাত ৮টায় দু'খানি গাড়ী গেট দিয়ে বের হল। প্রথম গাড়ীতে ছিলেন মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা মিস কেনেডি; দ্বিতীয়টিতে মিঃ কিংসফোর্ড দম্পতি। প্রথম গাড়ীটি কাছে আসতেই বিপ্লবীরা গাড়ীটি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন। প্রচণ্ডশব্দে বোমা বিস্ফোরিতও হল। নিহত হলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। সে যাত্রাও রক্ষা পেয়ে গেলেন মিঃ কিংসফোর্ড। উনি ত ছিলেন দ্বিতীয় গাড়ীতে। সে-গাড়ী নিরাপদে পৌঁছেছিল কিংসফোর্ড সাহেবের বাঙলোতে।

কাজ হাসিল করে ওরা সরে পড়লেন দু'জনেই। কিছুদূর একসঙ্গে গিয়ে তাঁরা দু'জনে দুদিকে ছুটলেন, প্রফুল্ল সমস্তিপুরের দিকে, আর ক্ষুদিরাম ওয়েনি ষ্টেশনের দিকে। ১লা মে মোকামাঘাটে দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জ্জীর চেষ্টায় স্থানীয় পুলিশ প্রফুল্লকে ধরতে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়। ধরা দেওয়ার পাত্র নন্ তিনি। তবে রিভলবারে তখনও গুলি আছে। নল নিজের দিকে ঘুরিয়ে গুলি ছুড়লেন। ঘটনাস্থলেই বীরের মৃত্যু তিনি বরণ করলেন।

ক্ষুদিরাম-ও ঐ একই দিনে ধরা পড়লেন 'ওইনি' ষ্টেশনে। মুজঃফরপুর থেকে ২০ মাইল দূরে। এতটা পথ কখনও ছুটে, কখনও হেঁটে এত ক্লান্ত হয়েছিলেন তিনি যে পকেট থেকে রিভলবার বের করবারও শক্তি ছিল না তার। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হল। ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইলেন বাঙলার এই সিংহশিশু।

প্রফুল্ল চাকীকে ধরতে পারলে হাজার টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে শুনেছিলেন নন্দলাল। হয়ত পেয়েছিলেনও। কেননা, তিনি প্রফুল্লকে সনাক্ত করবার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে মাথাটি কেটে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু কি তাই? আরো একটা পুরস্কার তার প্রাপ্য ছিল বিপ্লবীদের কাছ থেকে। ছ'মাসের মধ্যেই তাও তিনি পেয়ে গেলেন। বাঙলার বিপ্লবী নেতাদের বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর তাঁকে সার্পেণ্টাইন লাইনের মুখে গুলি করে হত্যা করেন বিপ্লবী বীর শ্রীশ পাল ও রণেন গাঙ্গুলী।

মুজঃফরপুরের সংবাদ পেয়ে কলকাতার পুলিশ হকচকিয়ে গেলেও একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে যায়নি। তাই ওরা প্রথমেই হাজির হল মাণিকতলা অঞ্চলের মুরারীপুকুরের বাগান বাড়ীতে। সেখানে অনেক কিছু পেয়ে গেল পুলিশ। গ্রেপ্তার করল ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সবাইকে। অরবিন্দের বাড়ী ঘেরাও করে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হল। শুরু হল আলিপুর বোমার মামলা। এক বছর ধরে মামলা চলল। বিচারের রায় বের হল আরো কিছুদিন বাদে। অরবিন্দ মুক্তি পেলেন, উল্লাসকর দত্ত ও বারীন্দ্রের হল মৃত্যুদণ্ড। আরো অনেকের সাজা হল। হাইকোর্টের রায়ে উল্লাসকর ও বারীন্দ্র ঘোষের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

এ সম্পর্কে শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশীযুগ' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "আলিপুর বোমার মামলায় প্রধানতঃ তিনটি বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—

প্রথম, অরবিন্দ বিলকুল তাঁর অপরাধ অস্বীকার করিয়াছেন এবং যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় বেকসুর খালাস পাইয়াছেন।

দ্বিতীয়, বারীন্দ্র প্রভৃতি অরবিন্দকে বাদ দিয়া নিজেদের দায়িত্বে সকল অপরাধ সরলভাবে স্বীকার করিয়া আইনের সর্ব্বোচ্চ শাস্তি, ফাঁসি, দ্বীপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয়, নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী (approver) হইয়া অরবিন্দকে জড়াইয়া সকল অপরাধ স্বীকার করায় জেলের ভিতরেই সত্যেন ও কানাই, উভয়ের দ্বারা পিস্তলের গুলিতে খুন হইয়াছেন।

আলিপুর বোমার মামলা পুলিশের কাছে এমন সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে যে পুলিশ এতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিনাবিচারে (Regulation III of 1818) অনেক নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

নরেন গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে কানাই ও সত্যেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কানাই হাসতে হাসতে ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করলেন ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর। ১০ দিন গেল, ২১ নভেম্বর ফাঁসীর রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করলেন সত্যেন বসু। তবু বিপ্লব-প্রচেষ্টা বন্ধ হল না। সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে আলিপুর পুলিশ কোর্টের মধ্যেই গুলি করলেন চারু বসু। ১৯০৯ সালের ১৯শে মার্চ তাঁর ফাঁসী হল। বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত ফাঁসিমঞ্চে আরোহন করলেন ১৯১০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। অপরাধ, গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মৌলভী সামসুল আলমকে হত্যা করা।

একালের বিপ্লব-প্রচেষ্টা শুধু বাঙলাদেশেই সীমাবদ্ধ রইল না। বাঙলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে মারাঠা থেকে বাঙলায় এসেছিল সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী। কয়েক বছর পরে বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লব মন্ত্র মারাঠাকে আবার সচকিত করে তুলল। বাঙলাদেশের মত সেখানেও প্রতিষ্ঠিত হল একটি গুপ্ত সমিতি, 'অভিনব ভারত' গণেশ সাভারকার ও তার ছোট ভাই বিনায়ক সাভারকারের নাম জড়িত হয়ে আছে এই সমিতির একেবারে আদিপর্ব্ব থেকেই। কর্ম্মসূচীও স্থির হয়ে গেল। ছোটভাই বিনায়ক

সাভারকার চলে গেলেন বিলাতে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার রসদ জোগাতে, আর বড় ভাই গণেশ সাভারকার 'অভিনব ভারতের' সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন।

নাসিকের জেলাশাসক জ্যাকসন মারহাটা বিপ্লবীবাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দেশবাসীর উপর অকথ্য উৎপীড়ন চালিয়ে। তিনি বদলি হয়ে যাচ্ছেন পুণায়। তাঁকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য এক সভা বসেছে। সেই সভাতেই বিপ্লবীর গুলিতে দেহত্যাগ করলেন জ্যাকসন। বিদায় সভায় বেজে উঠল চিরবিদায়ের করুণ-সুর। ঘটনাস্থলে ধরা পড়লেন অনন্ত লক্ষণ কানহেরে। পরে ধরা পড়লেন আরো অনেকে। বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হল অনন্ত লক্ষণের, বিনায়ক দেশপাণ্ডের ও কৃষ্ণগোপাল কার্ভের। ১৯১০ সালের ১৯শে এপ্রিল একই দিনে পরপর মারাঠার এই তিন বীর সন্তান ফাঁসিমঞ্চে জীবন উৎসর্গ করলেন। পুলিশ কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট হল না। অনেক সাক্ষীসাবুদ মালমশলা সংগ্রহ করে এরা শুরু করল নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা। প্রধান আসামী বিনায়ক সাভারকার। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিলাত থেকে তিনিই অস্ত্র সরবরাহ করেছেন 'অভিনব ভারত' সমিতির কাছে, আর সেই অস্ত্রেই নিহত হয়েছেন জ্যাকসন। বিচারে তাঁর হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল সুদূর মাদ্রাজে। বিপিন চন্দ্র পালকে মাদ্রাজের অধিবাসীরা গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাই আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর দণ্ডাদেশে মাদ্রাজে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মাদ্রাজে বিপিনচন্দ্র স্বরাজ সিংহ (The Lion of Swaraj) নামে পরিচিত, তার উপর নির্যাতন ? এ অপমান সহ্য করবে না মাদ্রাজের তরুণেরা। জনসভায় প্রতিবাদ শুরু হল। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার বরণ করলেন অনেকেই। দেশের বিপ্লবীরা উপলব্ধি করলেন খোলাখুলি আন্দোলনের সব পথই বন্ধ। তাই গুপ্ত পথ গ্রহণ করতে হবে। গঠিত হল 'ভারতমাতা এসোসিয়েশন' নামে গুপ্তসমিতি। স্থির হল টিনেভালির ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যাশকে নিধন করতে হবে। যে-কথা সেই কাজ। ১৯১১ সালের ১৭ই জুন মানিয়াচ্চি জনশনে আয়ারের গুলির আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তারপরে নিজের রিভলবার দিয়ে বীরের ইচ্ছামৃত্যু তিনি বরণ করলেন।

এইভাবে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। দিল্লীতে, ১৯১২ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উপর বোমা পড়ল, আর

তার পরের বছর বোমা ফাটল লাহোরের লরেন্স গার্ডেন্স্-এ। ১৯১২ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীর দরবার, সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে। লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতির পিঠে চড়ে চলেছেন দিল্লীর দরবারে। বিরাট শোভাযাত্রা। চাঁদনীচকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে আসতে না আসতেই বিরাট শব্দে ফাটল একটি বোমা। লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করেই এই বোমা। রৌপ্য নির্মিত হাওদার পশ্চাদ্ভাগ ভেঙে চুরমার। বোমার একটি টুকরা বড়লাটের গায়ে এসে লেগেছে। কাঁধের কাছে বিরাট এক ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। রক্ত-ক্ষরণ হচ্ছে প্রচুর। ওঁকে কোনক্রমে নামিয়ে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হল। হাতির মাহুত নিহত হল, নিহত হল হাওদার পেছনে বসে-থাকা আর্দালি। লর্ড হার্ডিঞ্জের ভাগ্য ভাল তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন, কিন্তু সারা দুনিয়ার কাছে বৃটিশ-রাজের মাথা হেঁট হয়ে গেল।

এর পরের বোমা বিস্ফোরণ লাহোরে। ১৯১৩ সালে। লাহোর লরেন্স গার্ডেনস্-এর গেটের সামনে এই বোমা বিস্ফোরণ। লক্ষ্য ছিল সিলেট জেলার কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গর্ডন। কিন্তু মরল তার আর্দালী। গর্ডন সাহেব বেঁচে রইলেন। তিনি কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন লাহোরে। এসেছিলেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে। কিন্তু, এ কেমনতর স্বস্তির নিঃশ্বাস। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এইভাবে বিপ্লবের আগুন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জ্বলে উঠতে লাগল। বৃটিশ সরকারের শত চেষ্টায়ও সে আগুন নিভল না। জ্বলে উঠল আরো দাউ দাউ করে।

এই প্রসঙ্গে একটি সরকারী মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী বাঙলার ডি আই জি বলেন, **"The continued occurrence of those crimes proves conclusively that the forces of revolution have in no way relaxed their activity and as will be shown later on, in spite of excellent checks administered and notwithstanding the capture during the year of several of the more, dangerous members, who were absconding for long periods, the extremely well-organised movement defies all our efforts at repression and is considerably more virile and troublesome at the beginning of 1915 than it has been in the past."**

সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লব-প্রচেষ্টা

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টার যে আয়োজন তা ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individual attempts) ১৯১৪-১৫ সাল থেকে সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লব-প্রচেষ্টার পথে পা বাড়াতে চেষ্টা করেছেন বিপ্লবী নায়কেরা। বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এই নূতন পথের পথিকৃৎ। তাঁরা যা করতে চেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত তা করতে পারেন নি বটে, কিন্তু সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তাঁরা পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে গদরপার্টি ও বজবজে কামাগাটামারুর অনুপ্রবেশও উল্লেখযোগ্য। ১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কামাগাটামারুর বিদ্রোহী শিখদের সঙ্গে বৃটিশ সৈন্যদলের যে সংঘর্ষ হয়—সেই সংঘর্ষই বিপ্লবীদের সম্মুখ সমরের পথ দেখিয়েছে।

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র

১৯১৪ সাল। বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। ভারতের বিপ্লবীরা ঠিক করলেন এ সুযোগ তাঁরা কাজে লাগাবেন। ইংরেজের প্রধানতম শত্রু জার্মানী। তাই ভারতবাসীর সে মিত্র। সেই কারণেই জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওরা নিশ্চয়ই ভারতকে অর্থ দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে রাজী হবে। এই ধারণা নিয়ে জোরকদমে চেষ্টা শুরু করলেন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের চেষ্টায় শেষকালে জার্মান সরকার ভারতের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজী হল। অস্ত্র তারা দেবে, দেবে অর্থও। অর্থ ও অস্ত্রের অভাবে ভারতে বিপ্লবের অগ্রগতি যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে রাজী হল জার্মানী। এই সংবাদে রাসবিহারী ও যতীন্দ্রনাথের কর্মতৎপরতা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। স্থির হল সারা উত্তর-ভারতকে এই নূতন পথের সামিল করবেন রাসবিহারী আর বাঙলাকে যতীন্দ্রনাথ।

মুহূর্তের বিশ্রাম নেই রাসবিহারীর, চোখে ঘুম নেই যতীন্দ্রনাথের। এক সপ্তাহের কাজ একদিনে সম্পন্ন হচ্ছে, উৎসাহের গতি এত দুর্বার। উল্কার বেগে রাসবিহারী ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশের বিভিন্ন প্রদেশে। এই সামগ্রিক বিপ্লবে সৈন্যদের সক্রিয় সহযোগিতা আগে দরকার, তাই বিভিন্ন সৈন্য-

শিবিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিপ্লবী নেতারা। আর বাঙলায় সংহত বিপ্লব-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ। তাঁর সর্বপ্রথম লক্ষ্য জার্মানী থেকে জাহাজ বোঝাই যে অস্ত্রশস্ত্র আসবে তা যেন নিরাপদে নামানো হয় হাতিয়ায়, নয়ত রায়মঙ্গলে, নয়ত বা বালেশ্বরে। কাজ ত সহজ নয়। তাছাড়া এ কাজের জন্যও চাই অর্থ ও অস্ত্র। অর্থ পাওয়া গেল ডাকাতি করে, অস্ত্র? অস্ত্রের জন্য রচিত হল রডা অস্ত্র অপহরণ পরিকল্পনা।

রডা অস্ত্র অপহরণ

আত্মোন্নতি সমিতির হাবু (শ্রীশ) মিত্র রডা কোম্পানীর কেরানী। তিনি খবর দিয়েছেন রডা কোম্পানীর জন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র এসেছে বিদেশ থেকে। এর মধ্যে আছে তিব্বতের দালাইলামার জন্য পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল, পঞ্চাশটি অতিরিক্ত স্প্রিং এবং পিস্তলের এমন ধারার পঞ্চাশটি খাপ যাদের সাহায্যে পিস্তলগুলিকে রাইফেলের মত ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া এই মালের সঙ্গে আছে পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড কার্তুজ। মালপত্র সবই জাহাজ থেকে নেমে গেছে, এগুলিকে ২-৩ দিনের মধ্যেই কাষ্টমস্ হাউস থেকে রডা কোম্পানীর ঘরে তুলতে হবে। স্বর্ণ সুযোগ। যেদিন তোলা হবে, সেদিনই রাজপথ থেকে এগুলিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। বৈঠক বসল। হাবু মিত্রের প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হল। একে বাস্তবে রূপায়িত করার ভার নিলেন মুক্তি সঙ্ঘের শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস, আত্মোন্নতি সমিতির হাবু মিত্র ও অনুকূল মুখার্জী।

২৬শে আগষ্ট (১৯১৪) দুপুরে মালবোঝাই সাতখানা গাড়ী যাচ্ছে কাষ্টমস্ হাউস থেকে রডা কোম্পানীর অফিসে। সকলের শেষের গাড়ীতে পরিকল্পনা অনুযায়ী হাবু মিত্র বোঝাই করে দিয়েছেন দালাইলামার জন্য প্রেরিত মালগুলি। এই গাড়ীর গাড়োয়ান হরিদাস দত্ত। সঙ্গে চলেছেন দু'জন সশস্ত্র প্রহরী শ্রীশ পাল ও খগেন দাস। ভ্যানসিটার্ট রো'র সামনে এসে ৬ খানা গাড়ী হাবু বাবুর সঙ্গে গলির মধ্যে ঢুকল, হরিদাস দত্তের গাড়ী সোজা চলল পূবদিকে। ইতিমধ্যে হাবুবাবু-ও এসে জুটেছেন। গাড়ীখানি নির্বিঘ্নে এসে পৌছল মালঙ্গা লেনে অনুকূল বাবুর বাড়ীর কাছে, বিপ্লবীদের হেপাজতে। অস্ত্রগুলি বিভিন্ন

বিপ্লবীদলগুলির মধ্যে বিতরণ করা হল। সারা ভারতে বিপ্লবের কর্মধারা চলল অব্যাহত গতিতে।

নেতারা যা চেয়েছিলেন তাই হল। টাকা পাওয়া গেল, পাওয়া গেল অস্ত্র। ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রকে সার্থক করা এবার সহজ হবে।

সর্ব্ব-ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা

সর্বভারতীয় বিপ্লবের দিন ধার্য্য হল ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত হল না কিছুই। কৃপাল সিং-এর বিশ্বাস ঘাতকতায় সব বানচাল হয়ে গেল। চারিদিকে গ্রেপ্তার শুরু হল। বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ধরা পড়লেন। মাল মশলাও অনেক পুলিশের হাতে পড়ল। ষড়যন্ত্র মামলা চলল। কারান্তরালে চলে গেলেন বহু বিপ্লবী নায়ক। ধরা পড়লেন না শুধু রাসবিহারী আর যতীন মুখার্জী। শেষ পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ বিপ্লব-প্রচেষ্টার আশায় রাসবিহারী চলে গেলেন জাপানে। ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের বোঝা একা মাথায় নিয়ে যতীন্দ্রনাথ রাতের অন্ধকারে আরো ভাল করে গা ঢাকা দিলেন। সঙ্গে তাঁর চারটি সংগ্রামী সাথী। প্রত্যেকের হাতে একটি করে মাউজার পিস্তল। বুড়িবালামের তীর ধরে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। মালবোঝাই জাহাজ আর এল না। এল না হাতিয়ায়, রায়মঙ্গলে, এল না বালেশ্বরেও। নিরাশ হলেও নৈরাশ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করা বিপ্লবের ধর্ম নয়, যতীন্দ্রনাথের ত নয়ই। নদীর তীর ধরেই এগিয়ে চললেন, পৌঁছে গেলেন গোবিন্দপুর গ্রামে। সেখানে এসে ভাদ্রমাসের ভরানদী পার হলেন। পুলিশ এ খবর আগেই সংগ্রহ করেছে। ওরা পিছু নিল। গ্রামের লোকদের কাছে প্রচার করল, কয়েকজন ডাকাত ঢুকেছে এ অঞ্চলে। ধরিয়ে দিতে পারলে বিরাট পুরস্কার। গ্রামবাসীও ওদের পেছনে লাগল। অনেক করে ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন বিপ্লবীরা যে ওরা ডাকাত নন, দেশসেবক। কিছু ফল হল না। বাধ্য হয়ে বিপ্লবীরা গুলি ছুড়লেন। জনতা পেছনে পড়ল। এই সুযোগে চাষখন্দরের কাছে এসে আবার নদী পার হলেন যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সংগ্রামী সাথীরা। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে সম্মুখসমরে প্রাণ দেবেন তাঁরা। ঘরে আর ফিরবেন না এই তাঁদের সংকল্প। চাষখন্দরের বালুময় প্রান্তরে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে স্বাধীনতা সংগ্রামে পথ চলার ইতিহাস। মহামৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমগ্রজাতি খুঁজে পাবে

মহাজীবনের পথ—স্বাধীনতার পথ। তাই চাঁদবালি বন্দরে পৌঁছেই ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করলেন যতীন্দ্রনাথ। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। একদিকে বহু সশস্ত্র শত্রু, অন্যদিকে মাত্র পাঁচটা স্বাধীনতা সৈনিক, সম্বল তাঁদের পাঁচটি মাউজার পিস্তল, আর সীমাহীন সংকল্প। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ গুরুতর আহত। পরের দিন বালেশ্বর হাসপাতালে তিনি শহিদের মৃত্যু বরণ করলেন। বন্দী হলেন নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ পাল। এইভাবে যুদ্ধ শেষ হল রচিত হল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নূতন ইতিহাস। কৃপাল সিং-এর জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা জাতির ললাটে যে কলঙ্কের রেখা এঁকে দিয়েছিল, রক্ত দিয়ে তা মুছে ফেললেন যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর বীর সেনানীরা। সমগ্র দেশ খুঁজে পেল ভবিষ্যৎ বিপ্লবের কর্মপন্থা। মৃত্যুর কর্মসূচী—যে কর্মসূচী ঘোষণা করে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল বিপ্লবীকুলতিলক সূর্যসেন ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন।

যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই ১৯১৭-১৮ সালে সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি ও কলতা বাজারে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন গোবিন্দ কর ও নিরঞ্জ পাল, নলিনী ঘোষ, নলিনী বাগচি ও তারিণী মজুমদার। কলতা বাজারের সম্মুখ-সমরে বীরের মৃত্যু বরণ করেন নলিনী বাগচি ও তারিণী মজুমদার। জনৈক ভারতবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় যে বিপ্লবকে ব্যর্থ মনে হয়েছিল—তা আবার চলল সার্থকতার পথে।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস

এল ১৯১৯ সাল। গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৮৮৫ সালে স্থাপিত কংগ্রেসের নরমপন্থার যুগ শেষ, এবার সংগ্রামের যুগ। যদিও সে সংগ্রাম অহিংস তবু সংগ্রাম সংগ্রামই—আবেদন নিবেদন নয়, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে প্রার্থনা নয়। কংগ্রেসের এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বিপ্লবীদের বিপ্লব-প্রচেষ্টার প্রভূত সুযোগ এনে দিল।

কথাটা যে কত সত্য স্বয়ং সূর্যসেন তা প্রমাণ করে গেছেন। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ যেদিন শুরু সেদিনও তিনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। সূর্যসেন বিপ্লবী। তিনি জানতেন সবার অলক্ষ্যে বিপ্লবের কাজকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন একটা কাল যবনিকার। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস এই কাল

যবনিকার কাজ করবে। যবনিকার বাইরে সূর্য্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের পরিচালক। যবনিকার অন্তরালে তিনি বিপ্লবীদলের অবিসম্বাদী নেতা। সূর্যসেনের বিপ্লবীদলের যাঁরা সভ্য তাঁরা প্রায় সকলেই এসেছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের বড় একটা যোগ নেই অথচ তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লবকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে হলে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত দরকার। জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা তাঁর দলের সভ্যদের অবশ্য করণীয়।

সূর্য্যসেন ও চট্টগ্রাম কংগ্রেস

চট্টগ্রাম কংগ্রেসকে তিনি ঢেলে সাজালেন। এর পতাকা বহন করে গ্রামে গ্রামে যাবে তাঁর দলের সভ্যেরা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হবে ঘনিষ্ঠ। সূর্যসেনের এ পরিকল্পনা যে কত সুদূর প্রসারী তা আমরা দেখেছি চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের পরে সূর্য্যসেন ও তাঁর সংগ্রাম-সাথীদের পলাতক জীবনের দিনগুলিতে। পুলিশ মথিত ও সৈন্য বিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা যদি মাষ্টারদার পিছনে এসে না দাঁড়াত তা হলে সূর্যসেন ও তাঁর দলের লোকদের মাসের পর মাস চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান সম্ভবপর হত না। কংগ্রেসই তাঁকে এ সুযোগ এনে দিয়েছে, এবং সূর্যসেন তা প্রাণভরে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ যে সূর্যসেন ও তাঁর সতীর্থদের এত ঝুঁকি নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন তার আরো একটা কারণ আছে। স্বদেশপ্রেম, চট্টগ্রাম মানুষের সহজাত গুণ। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরা এগুণের অধিকারী, কেননা বৃটিশ-বিরোধী অভিযানের একটা ঐতিহ্য আছে এই অঞ্চলের।

অতীতের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ইংরেজ রাজশক্তির জঘন্য অত্যাচার ও অবাধ লুণ্ঠন প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে বহুস্থানে। শুধু মৌখিক প্রতিবাদ নয়—সশস্ত্র প্রতিরোধও অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই প্রতিবাদ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ ইংরেজ রাজশক্তির লুণ্ঠন ও

অত্যাচারকে হয়ত থামাতে পারে নি, কিন্তু দেশের মধ্যে একটা নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। চট্টগ্রামে সে আশা ও উদ্দীপনার ঝড় উঠেছে ১৭৭৬ সাল থেকেই। সেই বছরই চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ ইংরেজ রাজ-শক্তির অবাধ লুণ্ঠন ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী চাকমারা। একদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজের পুলিশ ও সেনাবাহিনী, অপরদিকে তীর, ধনুক ও বর্শা হাতে নিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। অসম এই সংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘ ১২ বছর, তবু চট্টগ্রাম পরাজয় স্বীকার করে নি। শেষকালে ইংরেজ শক্তি বাধ্য হয়ে ওদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসে।

এই বিদ্রোহের ৭০ বছর পরে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামে অবস্থিত পদাতিক বাহিনী ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু শত্রুসেনার তুলনায় ওদের সংখ্যা খুব কম ছিল বলে এই অসম যুদ্ধে ওরা পরাজিত হয়। এই বিদ্রোহের পরে দীর্ঘ ৬৭ বছর কেটে যায়। ১৯২১ সালে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামে আবার অংশগ্রহণ করে চট্টগ্রাম।

এইভাবে প্রায় ১৫০ বছর চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অধিবাসীরা ও চট্টগ্রামের জনসাধারণ ইংরেজের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একটি সংগ্রামী ঐতিহ্য গড়ে তোলে। চট্টগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল সেই ঐতিহ্যই সূর্য্যসেনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবপথের বনিয়াদ।

সূর্য্যসেনের জন্ম ও বংশ পরিচয়

সূর্য্যকুমার সেন ১৮৯৪ সালের ২২শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম রাজমনি সেন, মাতার নাম শশীবালা। চার বোন ও দুই ভাই। ভাই দুটির মধ্যে সূর্য্যকুমারই ছোট। ওঁর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন ওঁর পিতৃদেব ইহধাম ত্যাগ করেন। সূর্য্যসেনকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার ভার নেন ওঁর বড় কাকা গৌরমনি সেন। চট্টগ্রামের ন্যাশন্যাল হাইস্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্ত্তি হন। ইণ্টারমিডিয়েট

পরীক্ষা তিনি পাশ করেন চট্টগ্রাম কলেজ থেকেই। বি. এ. পাশ করেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯১৭ সালে।

এই কৃষ্ণনাথ কলেজই সূর্যসেনের জীবনে বিরাট এক পরিবর্তন এনে দেয়। বিপ্লবমন্ত্রে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এই কলেজেই। কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তৎকালে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের সভ্য। কলেজের ভাল ভাল ছেলেদের তিনি বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সূর্যসেন। কিন্তু কেন? যে-গুণের সমাবেশ থাকলে কোন ছাত্র কোন শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সূর্য সেনের মধ্যে তার অনেক কিছুই নেই। অতি সাধারণ দোহারা গোছের চেহারা। অত্যন্ত লাজুক, শিক্ষকদের ত বটেই ছাত্রদেরও এড়িয়ে চলার অভ্যাস ছিল এই ছেলেটির। একান্ত সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদ; সাধারণ আচার-ব্যবহার। কোনটাতেই কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না। তবে এটা ঠিক যে তাঁর মত মেধাবী ছেলে খুব কমই ছিল কলেজে। সতীশবাবু নিজেই ছিলেন রত্ন, তাই রত্ন চিনে নিতে দেরী হয় নি। দিনের পর দিন চেষ্টা করে তিনি সূর্য সেনকে কাছে টানলেন, মন্ত্র দিলেন কানে। সূর্যসেন পথ খুঁজে পেলেন।

বহরমপুর কলেজ থেকে আবার চট্টগ্রামে

বি. এ. পরীক্ষা দিয়েই তিনি ফিরে এলেন চট্টগ্রামে। এসে কিছুদিনের মধ্যেই শহরের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ পেয়ে যান। ফল বের হল। বি. এ. পরীক্ষায় ভালভাবেই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। মাষ্টারি একেবারে পাকা হয়ে গেল। এখন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত।

চট্টগ্রামে ইতিমধ্যেই একটি বিপ্লবীদল গড়ে উঠেছিল। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনুরূপ সেন। উভয়েই সূর্য্যসেনের পরিচিত। বিনা দ্বিধায় সূর্য্যসেন ঐ দলে যোগ দিলেন; কিছুকালের মধ্যে দলের নেতৃত্ব এল তাঁরই হাতে। একদিকে সূর্য্যসেন বিপ্লবী নায়ক, সকলের দাদা, অন্যদিকে তিনি নামকরা শিক্ষক। দুই-এ মিলে তিনি মাষ্টারদা।

ইতিমধ্যে আত্মীয়স্বজনের চাপে সূর্য্য সেনকে একটি বিবাহ-বন্ধনেও আবদ্ধ হতে হয়েছে। কিন্তু চলার পথ তাতে বিঘ্নিত হয় নি। পতির দুর্গম পথযাত্রায় পুষ্পকুন্তলা কোনদিন বাধা সৃষ্টি করেন নি।

আসন্ন বিপ্লব ও সূর্য্যসেন

বিপ্লবী সূর্য্যসেন চির-বিদ্রোহী। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে সারাভারতের বিপ্লবের সাফল্য। তাই তিনি দেখছেন তাঁর প্রস্তুতিপর্বে যেন কোন খুঁত না থাকে। সারা ভারতবর্ষের অতীত দিনের সংঘর্ষগুলির কথা তাঁর অবিদিত নয়। বৃটিশ-বিরোধী ঐ সংঘর্ষগুলি থেকে যেমন তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, ঠিক তেমনি করেছেন অতীতের বিপ্লবী প্রচেষ্টাগুলি থেকে।

সমগ্র ভারতবর্ষে বিরাট বিপ্লব পরিকল্পনা তাঁর নয়। তাঁর পরিকল্পনা ছোট, সুসংবদ্ধ। কিন্তু, এর সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী। শুধু চট্টগ্রাম জেলার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকলেও সমগ্র ভারতবর্ষকে তা পরিপূর্ণ বিপ্লবের পথ দেখাবে। ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত অতীতের বিভিন্ন বিপ্লব-প্রচেষ্টাগুলির পর্য্যালোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, একটি সীমিত অঞ্চলে বৃটিশ সরকারকে সাময়িকভাবে পরাস্ত করে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। সে স্বাধীনতা ২।৪ দিনের হলেও তাঁর এ পরিকল্পনা যে কত বাস্তব চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহে তার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন। প্রোগ্রামের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আমার কর্মসূচী মৃত্যুর কর্মসূচী, অসংখ্য মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ সন্ধান পাবে নবজীবনের। কালরাত্রির পরেই ত নতুন প্রভাত। এটাই মাষ্টারদার স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতেই চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তিনি ১৯১৮ সালে। নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও দলের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি এক পাও অগ্রসর হতেন না। বছর খানেক গেল। কাজ এগিয়ে চলল সবার অজ্ঞাতে রাতের অন্ধকারে।

১৯১৯ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর নেতৃত্ব কংগ্রেসের সামনে খুলে দিল স্বাধীনতা অর্জনের নতুন পথ। এ পথে আছে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রাম। এতদিন কংগ্রেস মত্ত ছিল আবেদন-নিবেদনে, ভিক্ষাপাত্র ছিল তার সম্বল। গান্ধীজীর কংগ্রেস ছিঁড়ে ফেলল আবেদন-নিবেদনের সব কাগজপত্র ; ভেঙ্গে ফেলল এতদিনের সযত্নে পালিত ভিক্ষাপাত্র। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন আমরা সংগ্রামের পথ বেছে নিলাম, তবে আমাদের

সংগ্রাম হবে অহিংস। লাঠিসোটা নয়, ঢালতলোয়ার নয়, বন্দুক কামান নয়, অহিংসার মন্ত্র দিয়েই আমরা যুদ্ধ জয় করব। সত্য আর অহিংসা এই হবে আমাদের যুদ্ধের হাতিয়ার।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ঐদিন পাঞ্জাবের অংগর্ত অমৃতসর শহরে ডায়ার ও ডায়ারের দল সমবেত নিরস্ত্র জনতাকে পশুর মত হত্যা করেছে। ওদের অপরাধ রাউলাট বিলের সভায় যোগ দিতে গিয়েছিল ওরা; পাঞ্জাবে তখন সামরিক শাসন। জেনারেল ডায়ার-এর হাতে সর্ব্বময় কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্ব তিনি জাহির করলেন হাজার হাজার সমবেত জনতার উপর। কোন সতর্কবাণী উচ্চারণ না করেই গুলি-বর্ষণ করলেন। যতক্ষণ ওদের গুলি ছিল ততক্ষণ। চলল অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ। দু'হাজার নরনারী হতাহত হল।

বর্বরোচিত এই হত্যাকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ হয়নি এমন লোক ছিল না ভারতবর্ষে। প্রতিবাদে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ঝড় উঠল চট্টগ্রামেও। সেখানকার জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা একটি প্রতিবাদ সভা ডাকল। সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য একদল ছাত্র মাষ্টারদাকে আমন্ত্রণ জানাতে এল। মাষ্টারদা একটু হেসে ওদের বললেন, এত বড় নৃশংস হত্যাকাণ্ড, এতবড় অপমান, এর বিরুদ্ধে তোমরা শুধু সভায় বক্তৃতা দিয়ে প্রতিবাদই করবি—কোন প্রতিকার খুঁজবি না?

সমস্ত দেশ তখন অগ্নিগর্ভ। মহাত্মাজী সত্যাগ্রহের আহ্বান জানালেন বটে, তবে তিনি ধীরে চলার পক্ষপাতী। তাঁর ভয় জনতা হিংসার পথ না ধরে। এইভাবে চলল প্রায় দুটি বছর। এল ১৯২১ সাল। মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। বললেন এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ এনে দেবেন। **Swaraj within a year** এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ! মেতে উঠল দেশ। বাঙালার বিপ্লবীরা কিন্তু মাতল না, ওরা ত মহাত্মাজীর অহিংসা মন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। সেই জন্যই বিরোধিতা ত ওরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন এই বিপ্লবীদের সঙ্গে নিতে চান; কেননা ওদের সশস্ত্র বিপ্লবে তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন ওদের সংগঠনে যে বিরাট শক্তির আধার

এ বিশ্বাস তাঁর বহুদিনের। মহাত্মাজী এসেছেন কলকাতায়। চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীকে বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ জানালেন।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেশবন্ধুর বাড়ীতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে মহাত্মাজীর সঙ্গে বিপ্লবী নেতাদের বৈঠক বসল। আলোচনার ফলে বিপ্লবী নেতৃবর্গ মহাত্মাজীকে এক বছর সময় দিতে সম্মত হলেন—প্রতিশ্রুতি দিলেন এক বছর তাঁরা তাঁদের বিপ্লবকর্ম স্থগিত রাখবেন। শুধু তাই নয়, মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও রাজি হলেন।

অসহযোগ আন্দোলন ও সূর্য্যসেন

চট্টগ্রাম-ও বসে রইল না। মাষ্টারদার নেতৃত্বে সমগ্র চট্টগ্রাম এই অসহযোগ আন্দোলনের সামিল হল। এই আন্দোলন যখন একেবারে তুঙ্গে তখন আরো দুটি যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটল চট্টগ্রাম জেলায়। প্রথমটি, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ষ্ট্রাইক, দ্বিতীয়টি বর্মা অয়েল কোম্পানীতে ধর্মঘট। এই দুটি ধর্মঘটকে সফল করবার উদ্দেশ্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে এগিয়ে এল চট্টগ্রামের জেলা কংগ্রেস তার হিন্দু-মুসলমান সব সভ্যদের নিয়ে। সংগ্রামের এই সফল অগ্রগতিকে মহাত্মাজী তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়ায় অভিনন্দন জানালেন : বললেন, "সাবাস চট্টগ্রাম, Chittagong to the fore."

এত করেও কিন্তু স্বরাজ এল না। বছর শেষ হয়ে গেল ; ১৯২১-এর ৩১শে ডিসেম্বর পার হয়ে গেল, এল না মহাত্মাজীর স্বরাজ। ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী চৌরীচৌরার হিংসাত্মক ঘটনার অজুহাতে মহাত্মাজী বন্ধ করে দিলেন তাঁর আন্দোলন। ভারতবর্ষ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। মহাত্মাজীর সর্বশেষ আচরণে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে উঠল। মহাত্মাজীর ভক্ত-বৃন্দ কিন্তু তাঁর এই পশ্চাদপসরণকে ভিন্ন চোখে দেখলেন, বললেন, "The Country was all agog to witness the final triumph of soul force over physical might. But the gods had willed it otherwise."

আত্মার এই অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাস নেই বিদ্রোহীদের—বিশ্বাস নেই সূর্য্যসেনের। দৈহিক শক্তির সম্মুখীন তাঁরা হতে চান দৈহিক ও মানসিক শক্তির জোরেই। এক বছরে স্বরাজ যে আসবে না, বিপ্লবীরা তা জানতেন। তবু দেশবন্ধুর ইচ্ছায় ও মহাত্মাজীর অনুরোধে এক বছর তাঁরা তাঁদের রথের

রশি টেনে রেখেছিলেন। এখন, এক বছর পরে সে-রথ আবার চলবে তার পরিকল্পিত পথে।

পাহাড়তলী ডাকাতি

সূর্যসেনের নেতৃত্বে অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও নির্মল সেনের পরামর্শে আবার কাজ শুরু হল—আসন্ন বিপ্লবের প্রস্তুতির কাজ। বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে হলে চাই অস্ত্র, অস্ত্র কেনার জন্য চাই প্রচুর অর্থ। অর্থ আসবে কোথা থেকে। ডাকাতি? ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করা যায় ঠিকই, কিন্তু ডাকাতিতে ঝুঁকিও অনেক। তাই ভাবনা। মাষ্টারদা শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তারই ফলশ্রুতি পাহাড়তলী ডাকাতি। ডাকাতিতে অর্থ অবশ্য এল, কিন্তু, একা এল না, সঙ্গে এল বহু বিপদ আপদ।

পাহাড়তলী ডাকাতির পরে পুলিশের দাপট অনেক বেড়ে গেল। সূর্যসেন অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও অনন্ত সিং ধরা পড়লেন। মামলা শুরু হল। কিন্তু বেশি দিন চলল না। প্রমাণাভাবে আসামীরা মুক্তি পেলেন।

এদিকে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় দেশে বিপ্লবী কর্মতৎপরতা অনেক বেড়ে গেল। এই কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া গেল কলকাতা শাঁখারিটোলায় পোষ্টাফিসে ডাকাতি, চৌরঙ্গীতে অর্নেষ্ট ডে সাহেবের হত্যা, চট্টগ্রামে দারোগা প্রফুল্ল রায়ের নিধন, মাণিকতলায় ও দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানা আবিষ্কার, কাকোরী ট্রেনডাকাতি, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ভূপেন চ্যাটার্জ্জীকে হত্যা প্রভৃতি দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে। পুলিশ সব ব্যাপারের কোন কিনারা করতে না পেরে একে একে সব নেতাকেই গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। সেই সময়ে চট্টগ্রামের প্রায় সব বিপ্লবী কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। সূর্যসেন পালিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯২৬ সালে তিনিও ধরা পড়েন।

১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেস

১৯২৮ সালের মধ্যেই সব রাজবন্দী মুক্তি পেয়ে যান। মুক্তির পরেই আবার কাজ। মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। বাইরে এসেই প্রথমে হিসাব-নিকাশ, stock taking তারপরে কাজের নিশানা। একদিকে কংগ্রেসের কর্মধারা বিশ্লেষণ,

অন্যদিকে আসন্ন বিপ্লবের প্রস্তুতি। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস এখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশের জনসাধারণের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সুবিস্তৃত সেই প্রভাবের পটভূমিকাতেই আঁকতে হবে ভবিষ্যত বিপ্লবের রূপরেখা। তবেই তা বাস্তব হয়ে উঠবে। এটাই মাষ্টারদার অভিমত। চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্ব স্থির করেন, গণসংযোগের সুযোগ লাভের জন্য প্রত্যেককেই কংগ্রেস-সংগঠনে যোগ দিতে হবে। ছাত্র ও যুবককের গণ-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে মাষ্টারদা হলেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। লোকনাথ বল গড়ে তোলেন একটি শক্তিশালী ছাত্র-সংগঠন ও গণেশ ঘোষ একটি যুব-সংগঠন গড়ে তোলেন।

১৯২৮ সালের বাৎসরিক কংগ্রেস বসছে কলকাতায়। মূল সভাপতি মতিলাল নেহেরু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G.O.C.) সুভাষচন্দ্র। নারীবাহিনীর অধিনায়িকা, লতিকা বসু।

বিপ্লবী নায়কদের পক্ষে বিশেষ করে মাষ্টারদার কাছে ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। কেননা, এই কংগ্রেসের এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীই ১৯২৯ সাল থেকে আজাদহিন্দ, গঠনের পূর্বকাল পর্য্যন্ত বিপ্লবকাণ্ডের মূলাধার। দ্বিতীয়তঃ এই কংগ্রেসেই বাঙলার বিপ্লবীরা একত্রে দাঁড়িয়েছিল সুভাষচন্দ্রের পেছনে এবং তাদেরই প্রতিনিধিরূপে সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজী ও তার শিষ্যদের আনীত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব রাখেন কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে।

মনে রাখা দরকার যে ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস-এ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাব মহাত্মাজীর মনোমত হয়নি। তাই কলকাতা কংগ্রেসে নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণ করতে তিনি বদ্ধ পরিকর হন। নতুন শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত এই রিপোর্টের মূল কথাই ছিল ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস। এই রিপোর্ট গৃহীত হলেই মহাত্মাজীর কার্য্য সিদ্ধি হয় তাই এই ব্যাপক আয়োজন। কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসের মনোভাব দেখে এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসের পরে অনুষ্ঠিত ১৯২৮ সালে দেশের একাধিক প্রাদেশিক সম্মেলনে এই প্রস্তাবের পক্ষে জনসমর্থনের বহর দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। শেষকালে কলকাতা কংগ্রেস-এ একটা সমঝোতার সুর ফুটে ওঠে। তিনি বলেন,

'১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি বৃটিশ সরকার নেহেরু কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ না করে তবে আমরা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ করে দেব।'

এইভাবে একটা গোঁজামিল দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করলেন মহাত্মাজী। প্রস্তাব গৃহীতও হল। শুধু বিরোধিতা করলেন নেতাজী ও ভারতের বিপ্লবীরা। স্বাধীনতার সে প্রস্তাব অবশ্য নাকচ হয়ে যায়। মহাত্মাজীর পক্ষে ১৩৫০ ভোট, বিপক্ষে ৯৭৩ ভোট।

১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পার হয়ে গেল এবারও ১৯২১ সালের মতই। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের কোন প্রতিশ্রুতিই দিতে সম্মত হল না বৃটিশরাজ। আবার শুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন। আবার ব্যাপক ধর পাকড়, দেশ আবার অগ্নিগর্ভ। বাঙলার বিপ্লবীরা ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাক টাইম করছিলেন। এবারও অপেক্ষা করলেন গান্ধীজীকে একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য কিন্তু বাঙলার বাইরে হিন্দুস্থান সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিকান পার্টি আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। করেনও নি। ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর আইন সভায় বোমা ছুঁড়লেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। কেউ নিহত হন নি, দু'একজন সামান্য আহত। ওদের উদ্দেশ্যও তাই ছিল। কাউকে নিধন করতে ওঁরা যান নি। আইন সভায় বোমা ফেলে ওঁরা সারা দেশেকে শুধু জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিপ্লবীরা মরে নেই। পালাতে ওঁরা চান নি, স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করলেন। পুলিশ আবার সজাগ হয়ে উঠল। বোমা বিস্ফোরণের এক সপ্তাহ পরে ওরা লাহোরে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করল। একমাস পরে সাহারণপুরে আরো একটা। পুলিশের দিনের বিশ্রাম গেল, গেল রাতের ঘুম। মনে হচ্ছে চারিদিকে শুধু বোমার ফ্যাক্টরী—চারদিকে শুধু বিভীষিকা। ১৮ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হল, শুরু হল প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকেও আসামী করা হল। ১৩ মাস এই মামলা চলল। এই মামলার সময় ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও যতীন দাস অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

পূর্ণ-স্বাধীনতা ও ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্

৬৩ দিন অনশনের পর যতীন দাস পরলোক গমন করেন। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সারাদেশ। গান্ধীজীর তখনও আশা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের

প্রস্তাব ইংরেজ সরকার গ্রহণ করবে। এই পটভূমিকায় শুরু হল লাহোর কংগ্রেস। গান্ধীজীর নেতৃত্বে এবার গৃহীত হল পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব।

প্রস্তাব ত গৃহীত হল। এখন একে কাজে পরিণত করবে কে? গান্ধীজীর কংগ্রেস? বিপ্লবীরা তা বিশ্বাস করেন না। সূর্যসেন ত একেবারেই না। অহিংসার পথে স্বাধীনতা আসবে না। হবে না হবে না খোল তলোয়ার, এসব দৈত্য নহে তেমন। মাষ্টারদা আর দেরী করতে রাজি নন, প্রস্তুতিপর্ব তাঁর সম্পূর্ণ। দু'চার দিনের জন্য হলেও চট্টগ্রামকে তিনি স্বাধীন করবেন, এই পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর প্রস্তুতিপর্ব। তাতে চিরদিনের জন্য আসবে না চট্টগ্রামের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের ত নয়ই। তবে চট্টগ্রাম সমগ্র ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পথ দেখাবে। এই বিদ্রোহের নামকরণ করেছেন যুব বিদ্রোহ। বিদ্রোহের তারিখও নির্দ্ধারিত হয়েছে ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০। গুডফ্রাইডের ঐ দিনটি ইষ্টার বিদ্রোহের স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। তাই এই দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

১৩ই এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করবার কর্মসূচী আলোচিত হয় একটি গোপন সভায়। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) যুব-বিদ্রোহের দিন ও ক্ষণ: ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০, রাত ১০টা।

(২) যুব-বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক: সূর্যসেন

(৩) যুদ্ধের অধিনায়ক কমিটির সভ্যবৃন্দ: লোকনাথ বল, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ও উপেন ভট্টাচার্য্য।

(৪) বাহিনীর নাম: ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে পুলিশ আমারী আক্রমণে নেতৃত্ব করবেন অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ। লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের নেতৃত্বে আক্রান্ত হবে রেলওয়ে আমারী। টেলিগ্রাম ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করবার দায়িত্ব পড়ল অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর উপর। তা ছাড়া সৈন্য ও পুলিশের অবাধ চলাচল ব্যবস্থা ব্যাহত করবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ষ্টেশন থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে, ধুম ষ্টেশনের নিকটে জনশূন্য একটি স্থানে ঐদিন একই সময়ে রেল-লাইন থেকে ফিস-প্লেট সরান হবে। টেলিগ্রাফ পোষ্ট-ও উপড়ে ফেলা হবে। এতে চট্টগ্রাম পর্যান্ত সৈন্য চলাচল ও সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে।

শুধু শহরের বাইরেই নয়, শহরের মধ্যে অবস্থিত ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছিল। ভার দেওয়া হয়েছিল নরেশ রায়কে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঠিক হয় যে বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রগুলির আক্রমণে নেতাদের সঙ্গে থাকবে পাঁচ কিংবা ছয়জনের একটি করে দল। Indian Republican Army-র প্রথম শ্রেণীর ক্যাডাররা থাকবেন এই দলগুলিতে। তাছাড়া থাকবে একটা reserved force, এতে থাকবেন পঞ্চাশজন। এই পঞ্চাশজন দশভাগে বিভক্ত। ওরা থাকবেন চট্টেশ্বরী কালীবাড়ীর কাছে। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র ওরা মূলবাহিনীর সাহায্যার্থে এগিয়ে যাবেন।

পুলিশ অস্ত্রাগার দখল

১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) রাত ১০টা। উচ্চসামরিক অফিসারের পোষাক পরে অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ তাঁদের সংগ্রামী সাথীদের নিয়ে ঝটিকা আক্রমণে পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করলেন। পাহারারত পুলিশ, সামনে ছ'জন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার দেখে সেলাম করে একপাশে সরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি। গুলির আওয়াজ শুনে কাছাকাছি যারা ছিল সব পালাল। শুধু প্রহরারত সেপাইরাই নয় পেছনের ব্যারাকের ৫০০ সেপাইও ভয়ে পালাল। সঙ্কেত ধ্বনি শুনে চট্টেশ্বরী কালীবাড়ী থেকে সংরক্ষিত বাহিনীর ক্যাডাররাও এসে হাজির হলেন পুলিশ অস্ত্রাগারে। হাতুড়ি দিয়ে অস্ত্রাগারের তালা ভাঙ্গা হল। পাওয়া গেল অনেক রাইফেল, প্রচুর গুলি, বহু অস্ত্রশস্ত্র। প্রত্যেককেই দেওয়া হল একটি করে রাইফেল ও গুলি। নিকটেই সর্ব্বাধিনায়কের হেড্‌কোয়ার্টারস্‌। কাজ সমাধা করে সবাই সেখানে উপস্থিত হলেন। এটাই মাষ্টারদার নির্দেশ।

অক্‌জিলিয়ারী ফোর্স অস্ত্রাগার আক্রমণ

ঠিক একইভাবে এই অস্ত্রাগারটি-ও দখলে এল লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের চকিত আক্রমণে। এখানেও ওরা দুজন ভূষিত হয়ে এসেছিলেন উচ্চ সামরিক অফিসারের পোষাকে। তাই দখল করতে মুস্কিল হয়নি একটু-ও। মুস্কিল হল রাইফেল-এর গুলি সংগ্রহে। রাইফেল ত অনেক আছে, কিন্তু রাইফেল-এর ঘরে গুলি নেই একটি-ও। শুধু রাইফেল নিয়ে লাভ কি? গুলিহীন রাইফেল, লাঠি বইত নয়। তাই পেট্রল ঢেলে জালিয়ে দেওয়া হল অধিকাংশ রাইফেল।

কয়েকটা রাইফেল অবশ্য সঙ্গে নেওয়া হল, আর নেওয়া হল রিভলবার ও মেশিনগান। এবার লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের পরিচালনায় বাহিনীর সবাই হাজির হলেন সর্বাধিনায়কের হেড্‌কোয়ার্টারস্‌-এ। অকজিলিয়ারী ফোর্স অস্ত্রাগার দখলে এতক্ষন সময় কেন লাগল তা মাষ্টারদাকে বললেন লোকনাথ বল ও নির্মল সেন। লোকনাথ বল বললেন, "অস্ত্রাগার ত মুহূর্তের মধ্যে দখল করে ফেললাম, কিন্তু ঐ অস্ত্রাগারের অধিকর্তা, মিঃ ফেরেল কিছুটা দেরী করিয়ে দিলেন। অস্ত্রাগারের বাইরেই তার বাসগৃহ। গুলির আওয়াজ ও হৈ-হল্লা শুনে কোন কিছু বুঝতে না পেরে অস্ত্রাগারের দিকে তিনি ছুটে আসছিলেন। গেটে ঢুকতে যাবেন এমন সময় রাইফেলের একটা গুলি তার বুকে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন মিঃ ফেরেল। স্বামীর পেছনে পেছনে ছুটে আসছিলেন মিসেস ফেরেল। আমি তাকে একরকম জোর করেই ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, আপনি ঘরে ফিরে যান, একপা এগিয়েছেন কি মরেছেন।"

খবর পেয়ে অবশ্য চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-ও তার মোটরে করে অকজিলিয়ারী ফোর্স-এর অস্ত্রাগারে এসে হাজির হয়েছিলেন। বিপ্লবীদের গুলিতে আহত হল তার দেহ-রক্ষী, আহত হল ড্রাইভার। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। এই কারণেই আমাদের এত দেরী।

এদিকে ঠিক রাত ১০টায় টেলিফোন হাউস আক্রমণ করেন অম্বিকা চক্রবর্তী ও তার দলের কান্ডারিরা। অত্যন্ত সহজেই দখল করা সম্ভব হল টেলিফোন হাউস। ভেঙ্গে ফেলা হল টেলিফোন যন্ত্রটি, পেট্রলের আগুন জ্বলল টেলিফোন-বোর্ড-এ। ভবনটি একেবারে অকেজো হয়ে গেল। কাজ সমাধা করে সামরিক হেড্‌কোয়ার্টারস্‌-এ চলে এলেন অম্বিকা চক্রবর্তী ছোট্ট তার দলটিকে নিয়ে।

ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে দলনেতা নরেশ রায় হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। আক্রমণ করা সম্ভবপর হল না। কেননা সেদিন ছিল 'গুড্‌ফ্রাইডে'। ক্লাব বন্ধ।

যে যার কাজ করে সবাই যখন সর্বাধিনায়কের হেড্‌কোয়ার্টার্স-এ এসে সমবেত হলেন তখন সেখানে অন্তহীন উন্মাদনা। সেই রাত্রিতেই সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। **Indian Republican Army**-র সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন। জাতীয় পতাকার সম্মানার্থে তিনবার বন্দুকের আওয়াজ

করা হয়। তারপর মাষ্টারদা এক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ঘোষণায় তিনি বলেন, "চট্টগ্রাম আজ স্বাধীন, প্রায় দু'শ বছরের পরাধীনতার গ্লানি থেকে চট্টগ্রাম আজ মুক্ত। সমগ্র জেলা থেকে সাম্রাজ্যবাদকে অপসারিত করে চট্টগ্রামকে স্বাধীনতার জয়মালা পরিয়েছে Indian Republican Army-র চট্টগ্রাম শাখা। এ বিরাট দেশে চট্টগ্রাম কতটুকুই বা। এ স্বাধীনতাই বা কত দিনের কে জানে? তবু স্বাধীনতা স্বাধীনতাই। ভারতবর্ষের আগামী দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামে এর গুরুত্ব অপরিসীম'। এই ঘোষণার পরে স্বাধীন চট্টগ্রামে এক সামরিক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রধান পরিচালক মনোনীত হন বিপ্লবী মহানায়ক সূর্যসেন। এর পরে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তব্যে মাষ্টারদা তাঁর মৃত্যুর কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। সভার শেষে তিনটি ছাপান ইস্তাহার বিলি করা হয়। প্রথমটিতে ছিল সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং Indian Republican Army-কে সমর্থনের আহ্বান। দ্বিতীয়টিতে ছাত্র ও ও যুবকদের উক্ত বাহিনীতে যোগদানের আমন্ত্রণ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি-আক্রমণ ব্যর্থ করবার সঙ্কল্প ঘোষণা। তৃতীয়টিতে শত্রুর গুপ্তচর ও বিদেশী বিশ্বাস-ঘাতকদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে স্বাধীন সরকারের হাতে তুলে দেওয়া।

এ পর্যন্ত কলকাতায় বিদ্রোহের এ খবর যায় নি। বেশ কিছুক্ষণ পরে বড় একটি মালের জাহাজ থেকে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সংবাদ wireless-এ কলকাতা ফোর্ট-উইলিয়মে জানিয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, উক্ত জাহাজটিকে বন্দর থেকে মাঝদরিয়ায় সরিয়ে এনে নিরাপত্তার খাতিরে চট্টগ্রামে অবস্থিত ইংরেজ বাসীন্দাদের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ঐ জাহাজে বোঝাই করা হয়। সারারাত ঐ জাহাজেই তাঁরা কাটান। এই ত গেল চট্টগ্রাম শহরের অবস্থা। শহরের চারদিকের অবস্থাও ভাল ছিল না, ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতেই ধুম ষ্টেশনের অদূরে রেল চলাচল ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। রেল-লাইনের ফিস-প্লেট সরিয়ে ফেলায় ঐ দিন রাত্রিতেই একখানি বোঝাই মালগাড়ী লাইনচ্যুত হয়। সমস্ত রেল চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

অপ্রত্যাশিত গুলিবর্ষণ

কাজগুলি এগিয়ে যাচ্ছিল সুনির্দিষ্ট গতিপথে। কিন্তু অকস্মাৎ একটা অনর্থের সৃষ্টি হল। সেদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ঘোষণা বাণী পাঠের

পরে সর্বাধিনায়কের হেড্‌কোয়ার্টারস-এ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছিল, অকস্মাৎ লুইসগানের আওয়াজ সবাইকে সচকিত করে তুলল। প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীরাও গুলি চালালেন। অবিরাম চলতে লাগল গুলিবর্ষণ, সহসা সামনের দিকের একটি মর্মান্তিক দৃশ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় কে যেন এদিকে ছুটে আসছে। হিমাংশু! হিমাংশু সেন! বলে চীৎকার করে উঠল সবাই। তাকে মাটিতে ফেলে তাঁর গায়ের আগুন নিভিয়ে ফেলা হল। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ওকে মোটরে চাপিয়ে শহরের দিকে নিয়ে গেলেন অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ। সঙ্গে গেলেন আনন্দ ও জীবন।

এদিকে শত্রুপক্ষের লুইসগান গুলি বর্ষণ করেই চলেছে। মাষ্টারদার সন্দেহ হল পুলিশ দলে ভারি হয়েছে তাই এত গুলি। তিনি ভাবলেন এবার হয়ত সামরিক বাহিনীর সাহায্যে পুলিশ ওদের ঘেরাও করে ফেলবে। আর বিলম্ব করলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আত্মগোপনের পথ খুঁজে বের করতে হবে। যেতে হবে প্রথমে পাহাড়ের দিকে। কিন্তু, অনন্ত সিং ও গনেশ ঘোষ ত এখনও ফিরলেন না। তু'ঘণ্টা কেটে গেল আর দেরী করা উচিত নয়। অবিলম্বে স্থান ত্যাগের নির্দ্দেশ এল সর্বাধিনায়কের। যথাসম্ভব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললেন সূর্যাসেন ও তাঁর সেনাদল। পেছনে পড়ে রইলেন অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ। ওঁরা কোথায় কে জানে?

এদিকে অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ হিমাংশু সেনকে বাড়ীর কাছে নামিয়ে দিয়ে শহরের পরিস্থিতি কিছুটা দেখে ফিরে এলেন সর্বাধিনায়কের হেড্‌-কোয়ার্টারস্‌-এ। সঙ্গে আছেন আনন্দ ও জীবন। এসে দেখেন কেউ সেখানে নেই। তু'দলের মধ্যে বিচ্ছেদ পাকা হয়ে গেল। মাষ্টারদা ধরলেন পাহাড়ের পথ, ওরা ফিরে গেলেন অজানার পথে।

মাষ্টারদার বাহিনী খুব ক্লান্ত। তু'দিন কেটেছে পাহাড়ে পাহাড়ে। ওঁরা এখনও অভুক্ত। মাষ্টারদার কাছে এখন তুটি সমস্যা, আহার্য্য ও বাসস্থান। তবে প্রথমটি সবচেয়ে জরুরী। খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে শহর থেকে, কিন্তু শহরের অবস্থা কি তা কে জানে। তু'জন বাছাই করা কেডারকে তিনি শহরে পাঠিয়ে দিলেন। তুটি কাজ তাদের। প্রথম কাজ শহরের পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেওয়া, দ্বিতীয় কাজ শহর থেকে কিছু খাবার সংগ্রহ করা। ওদেরকে

বলা হল রাত ৭টার মধ্যে ফিরে আসতে। কিন্তু, ৭টা ত দূরের কথা, ৯টার মধ্যেও ওরা ফিরে এলেন না। অনন্যোপায় হয়ে মাষ্টারদা সাথীদের সবাইকে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হলেন। তাতে অবশ্য ঝুঁকি অনেক ; কিন্তু, মাষ্টারদা জানতেন যে খালিপেটে যুদ্ধ চলে না। তাই একদিকে খাবার অপরদিকে নিরাপদ আশ্রয়—এ দুটোই আজ তাকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই হল না। শহরের কাছাকাছি আসতেই রাত শেষ হয়ে এল, আলো ফুটল আকাশে। তাই আর অগ্রগতি নয়, আবার পশ্চাদপসরণ। এবার জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে। মাষ্টারদার নির্দ্দেশে সবাই পাহাড়ে উঠে গেলেন। পুলিশের কাছে কিন্তু এ খবর অজানা রইল না। সৈন্যবাহিনীও খবর পেল। ২২শে এপ্রিল ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার বাহিনী ও সুর্মাভ্যালী বাহিনী জালালাবাদ পাহাড়কে ঘিরে ফেলল। অতি ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে চারদিকে লক্ষ্য রেখে ফৌজী সেনারা এগিয়ে চলল। চলল ত, কিন্তু, কোন দিকে যাবে ? ওরা শুধু জানে যে বিদ্রোহীরা আছে এই পাহাড়ে। কিন্তু, ঠিক কোনদিকে আছে ; কোথায় আছে তার খবর ওরা কিছু রাখে না। বিদ্রোহীরা খবর পেয়েছে যে শত্রুসেনা পাহাড়টাকে ঘিরে ফেলেছে, সংঘর্ষ অনিবার্য্য। তাই ওরাও তৈরী। মাষ্টারদার নেতৃত্বে ও লোকনাথ বলের পরিচালনায় বিদ্রোহী সেনারা জিরো আওয়ার (Zero hour)-এর প্রতীক্ষায় আছে। শত্রুসেনা বিপ্লবী বাহিনীর নিশানার মধ্যে আসতেই গুলিবর্ষণের নির্দেশ দিলেন অধিনায়ক লোকনাথ বল। শত্রুসেনা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হল। আবার ওরা বেশী সংখ্যায় পাহাড়ে উঠতে চেষ্টা করে, আবারও বিপর্যয়। তৃতীয়বার অর্দ্ধেক পথ উঠতে না উঠতেই বিদ্রোহীরা প্রচণ্ডভাবে গুলি বর্ষণ করে। এবারও ব্যর্থকাম হয়ে ওরা ফিরে গেল। কিছুক্ষণ শত্রুসেনারা একেবারে চুপচাপ। কোন সাড়াশব্দই নেই। একটু পরেই প্রচণ্ড গুলি। মেসিনগানের গুলি আসছে পাশের দুটি উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে। বিদ্রোহী সেনারাও গুলিবর্ষণ শুরু করলেন। শত্রুসেনার গুলির আঘাতে বিদ্রোহীবাহিনীর হরিগোপাল বল (টেগরা), প্রভাস বল, নির্মল লালা, পুলিন ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, জিতেন দাশগুপ্ত, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা সেন, শশাঙ্ক দত্ত, মতি কানুনগো ও অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার বীরের মৃত্যু বরণ করেন। মারাত্মক আহত হন অম্বিকা চক্রবর্ত্তী। শত্রুপক্ষের প্রায় ৮০ জন সৈনিক নিহত হয়। জালালাবাদ যুদ্ধে শত্রুসেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করেন।

ঐ দিনই মধ্যরাত্রে ফেণী স্টেশনে চারজন বিদ্রোহী স্বাধীনতা সংগ্রামীর সহিত পুলিশের সংঘর্ষ হয়। বিদ্রোহীরা পরম দুঃসাহসিকতায় পুলিশ কর্ডন ভেঙ্গে পালিয়ে যায়।

জালালাবাদ যুদ্ধের পর মাষ্টারদা তাঁর বাহিনীর সবাইকে নিয়ে নীচে নেমে আসেন এবং দূরের কয়েকটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আশ্রয়দাতাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ঘরের লোকজনও যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন সাধারণ মানুষ, হিন্দু ও মুসলমান।

দেখতে দেখতে চট্টগ্রাম জেলায় ১০।১২ দিনের মধ্যেই রাইফেল, মেসিনগান, টমিগান প্রভৃতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বহু ফৌজ এসে যায়। এ খবর পেয়ে মাষ্টারদা যুদ্ধের টেকনিক বদলে ফেলেন। তিনি নির্দেশদেন সম্মুখযুদ্ধ আর নয়, এবার গেরিলাযুদ্ধে শত্রুপক্ষকে বিপর্যস্ত করতে হবে।

কালারপোল

আঘাত, শুধু আঘাত। একটি শেষ হতে না হতেই আর একটি। শত্রুপক্ষ যেন দম ফেলবার অবকাশ না পায়। এই উদ্দেশ্যেই কালারপোলের সংঘর্ষ। ৩ই মে, ১৯৩০। নদীর ধারে অবস্থিত বালেষ্টাইন ঘাটে একটি ফৌজী চৌকি আক্রমণ করতে এসেছিলেন ৬জন বিদ্রোহী সৈনিক। ওরা চেয়েছিলেন ঝটিকা আক্রমণে চৌকিটি বিধ্বস্ত করে ফেলা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ওরা আগেই পুলিশের নজরে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ওরা একটি সাম্পানে চেপে নদীর ওপারে কালারপোলে চলে যান। কিন্তু, সেখানেও পুলিশ। বিদ্রোহীদের ওরা ঘেরাও করে ফেলে। বিদ্রোহীরাও ছাড়বার পাত্র নন্। গুলি বর্ষণ করতে করতে অবরোধের প্রাচীর ভেঙে ফেলে ওরা বেরিয়ে যাবেন এই ওদের সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করার আগেই ধরা পড়ে যান সুবোধ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র নন্দী। ছ'জনের মধ্যে বাকি রইলেন দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন ও রজত সেন। বুঝতে পারলেন ওরা যে শত্রুসেনা এত অধিক যে পালান অসম্ভব। একটা শনখেতের মধ্যে রাত্রির জন্য আশ্রয় নিলেন। পরের দিন আবার সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষে বীরের মৃত্যু বরণ করে ওরা অমর হয়ে রইলেন—গৌরবের পথে এগিয়ে চলল মাষ্টারদার মৃত্যুর কর্মসূচী।

শুধু চট্টগ্রাম ও তার চারদিকেই নয়, বাঙলার দূর দূরান্তেও মাষ্টারদার মৃত্যুর কর্মসূচী রূপায়ণে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল না। কলকাতার কিছু দূরে ফরাসী চন্দননগরে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের এক সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে স্বাধীনতার বেদিমূলে জীবন উৎসর্গ করেন চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের বীর সৈনিক মাখন ঘোষাল। তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর।

তিনমাস পরে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালিপদ চক্রবর্তীর গুলিতে চাঁদপুর রেলষ্টেশনে নিহত হন তারিণী মুখার্জী। বিপ্লবীরা গিয়েছিলেন পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে হত্যা করতে—কিন্তু ভুলক্রমে তারিনী মুখার্জীকে গুলি করলেন। বিচারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। ১৯৩১ সালের ৪ঠা আগষ্ট তিনি জীবনের জয়গান গাইলেন ফাঁসীর মঞ্চে।

মাষ্টারদার এরপরের লক্ষ্য চট্টগ্রাম জেলার ডি. এস. পি. আশানুল্লা ও ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্ণো। ৩১শে আগষ্ট নিহত হন আশানুল্লা। দু'মাসের মধ্যে আগুন জলে ওঠে ঢাকায়—বিদ্রোহী বীর সরোজকান্তি গুহের গুলিতে ডুর্ণো গুরুতর আহত হন।

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন, ধলঘাট সংঘর্ষ। ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে এসেছেন মাষ্টারদা ও নির্মল সেন। অপূর্ব্ব সেনও আছেন ধলঘাটে। প্রীতিলতা, ওয়াদেদারও এলেন মাষ্টারদার জরুরী তলব পেয়ে। কথাবার্তা চলছে এমন সময় খবর এল যে কামরণের নেতৃত্বে একদল বৃটিশ সেনা বাড়িটিকে ঘিরে ফেলেছে। বিপ্লবীরা দোতলায়। সেনাদল নীচে। উপরে উঠবার একটিমাত্র বাঁশের সিঁড়ি। শত্রুসেনার অধিনায়ক সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করতেই নির্মল সেনের গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর উভয়পক্ষের গুলিবর্ষণ শুরু হয়। শত্রুপক্ষের গুলিতে নিহত হন নির্মল সেন ও অপূর্ব্ব সেন। আর এই ফাঁকে ঘরের পেছন দিক দিয়ে মাষ্টারদা সূর্যসেন রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যান।

১৯৩২ সালের ২৯শে জুলাই মাষ্টারদার নির্দ্দেশে শৈলেশ্বর রায় কুমিল্লার পুলিশ সুপার এলিসনকে হত্যা করে নির্বিঘ্নে চট্টগ্রাম ফিরে আসেন।

পাহাড়তলী পুলিশ ক্লাব আক্রমণ ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। এই অভিযানে নেতৃত্ব করেন প্রীতিলতা ওয়াদেদার। আক্রমণ পর্ব্ব সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করে তিনি সেখানে আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নেন।

ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে প্রীতিলতাই প্রথম নারী শহিদ্। ইতিহাস তাঁকে ভুলবে কি করে ?

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মাষ্টারদার মৃত্যুর কর্মসূচী এইভাবে এগিয়ে চলল। দেশের বিপ্লবীরা তাঁর এ কর্মসূচীকে গ্রহণ করেছেন তাই একদিক দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। কিন্তু, আপনাকে নিয়ে, সংগ্রামী তাঁর সাথীদের নিয়ে চিন্তার অবধি নেই মাষ্টারদার। সবার অলক্ষ্যে, পুলিশ ও শত্রুসেনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁকে পথ চলতে হবে। বিরাম নেই মুহূর্তের। কিন্তু, অকস্মাৎ বিপদ এল সুড়ঙ্গ-পথে। থামতে হল তাঁকে। ১৯৩৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী। জনৈক প্রতিবেশীর লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে তিনি ধরা পড়লেন। আলো নিভে গেল। নেমে এল অন্ধকার, কিন্তু, তা ক্ষণিকের।

১৮ই মে গহিরায় সংঘর্ষ। একদিকে পুলিশ ও শত্রুসেনা, অন্যদিকে মাষ্টারদার মন্ত্রশিষ্যেরা। ধরা পড়লেন তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত; সংগ্রাম বন্ধ হল না।

১৯৩৩ সালের ১৪ই আগষ্ট, মাষ্টারদার মামলার রায় বের হল। মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃত্যুদণ্ড এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

সংগ্রাম তবু বন্ধ হল না। ১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারী। বিদ্রোহীরা ঠিক করলেন, মাষ্টারদার মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে হবে। সভা করে নয়, রক্তের হোলি খেলে। পল্টনের মাঠ। চারজন সশস্ত্র যুবক পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়েছে মাঠে। মাঠে ঢুকেই গুলি। মাঠে যত ইংরেজ নরনারী ছিল সবাইকে ওরা আক্রমণ করল। তারপরে সংঘর্ষ বাধল পুলিশের সঙ্গে। পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করলেন হিমাংশু চক্রবর্তী ও নিত্য সেন। কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর ফাঁসির হুকুম হল। মৃত্যুর কর্মসূচী নতুন জীবনের পথ দেখাল।

৯ই জানুয়ারী, ১৯৩৪। বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে হত্যা করা হল তার খাওয়ার ঘরে। মাষ্টারদাকে ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার হাতে হাতেই মিলল।

১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪। রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই যুব-বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক সূর্য্যসেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসিমঞ্চে হত্যা করা হয়। মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরের মৃতদেহ তাঁদের আত্মীয়স্বজনের হাতে দেওয়া হয়নি। সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সমুদ্রতীরে। তারপরে একটি

জাহাজে করে মৃতদেহ দুটি গভীর সমুদ্রে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রের জলে। প্রতিশোধ গ্রহণের এমন হীন ব্যবস্থা আর কোন সভ্য সমাজে নেই। মৃত্যুর কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন সূর্যসেন। সে কর্মসূচী শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, আর তা পরিপূর্ণ হয়ে-উঠল ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রভাব

মাষ্টারদা যুব-বিদ্রোহকে শুধু চট্টগ্রাম জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেও তিনি জানতেন যে এ বিদ্রোহের হোমানল বাঙলার সর্বত্র ত জ্বলবেই। জ্বলবে বাঙলার বাইরেও। তাঁর ধারণা যে কত নির্ভুল আজ তা সকলেরই জানা। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, "১৯২৯ সালের জুলাই মাস। 'এ-আই-সি-সি'র বৈঠকের পরে সূর্যসেনের সঙ্গে একই গাড়ীতে ঘরে ফিরেছিলাম। নিভৃতে আলাপ-আলোচনা হল অনেকক্ষণ। বিষয় আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম। বুঝতে পারলাম উনি প্রস্তুত। এখন একটি শুভদিনের প্রতীক্ষামাত্র। আর কালক্ষয় করতে রাজি নন তিনি। মনে আছে ওঁকে সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আমিও প্রস্তুত। উনি যদি বিপ্লবের হোমানল অবিলম্বে জ্বালেন আমার কাজ হবে সে হোমানলকে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। আমার প্রতিশ্রুতি আমি রেখেছি।" হেমচন্দ্রের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বিপ্লবের হোমানল মাষ্টারদা জ্বাললেন, ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। আর সে আগুন হেমচন্দ্র ছড়িয়ে দিলেন ঢাকা, কলকাতা, মেদনীপুর ও কুমিল্লায়। আগুন জ্বলে উঠল দার্জিলিং-এর হিমশীতল পাহাড়ি এলাকায়-ও। চারবছর চলল সে বহ্নি-উৎসব।

সূর্যসেন প্রথম আঘাত হানলেন চট্টগ্রামে। শুরু হল মারের পর মার, আঘাতের পর আঘাত। এগিয়ে এল অনুশীলন আর যুগান্তর, এগিয়ে এল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। এগিয়ে এল ছোট বড় সব বিপ্লবী দল। সূর্যসেনের আহ্বান উঠেছে আকাশে: বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক। ঘরে আর বসে থাকবে কে! ২৫শে আগষ্ট, টেগার্টকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হল, নিহত হলেন অনুজা সেন। তারপরে আঘাত হানতে শুরু করল হেমচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। ২৯শে আগষ্ট আগুন জ্বলল ঢাকায়। মিটফোর্ড হাসপাতালের বারান্দায় সেদিন বিনয় বসুর গুলিতে নিহত হলেন, লোম্যান, আহত হলেন হডসন্। এর ঠিক

একশ দিন পরে অনুষ্ঠিত হল বিনয়-বাদল-দীনেশের ঐতিহাসিক রাইটার্স-বিল্ডিংস অভিযান। নিহত হলেন সিম্পসন, আহত হলেন অনেকে। এই অভিযানে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর পরমপ্রাপ্তি, বিনয় বসু ও সুধীর গুপ্তের আত্মাহুতি ও ফাঁসির মঞ্চে দীনেশ গুপ্তের আত্মোৎসর্গ। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল এই তিন বছরে মেদনীপুরে একের পর এক তিনটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর মেদনীপুরের ছেলেরা। মেদনীপুরের এ-বহ্নি উৎসবকে প্রজ্বলিত রাখতে গিয়ে 'বি-ভি'র যে কাণ্ডারীরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, মৃগেন দত্ত, অনাথ পাঁজা, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নির্মলজীবন ও নবজীবন ঘোষ। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার কাহিনীকে আরো গৌরব মণ্ডিত করেছে কুমিল্লা শহরে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিধনের অবিশ্বাস্য কাহিনী। ১৯৩৪ সালে 'বি-ভি'র যে কর্মকাণ্ড তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য দেওভোগ সংঘর্ষ। যে সংঘর্ষের ফলে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণবিসর্জন করেন নারায়ণগঞ্জের মতি মল্লিক। তদানীন্তন গভর্ণর বাঙলায় যে ব্লাক এণ্ড ট্যান পদ্ধতি চালু করতে চেয়েছিলেন তারই প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেওভোগ সংঘর্ষ। এর পরে 'বি-ভি'র চরম প্রয়াস লেবং-এর রেস্-কোর্সে। বাঙলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনকে সেখানে গুলি করার অভিযোগে ভবানী ভট্টাচার্য্যের উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

এই প্রসঙ্গে ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা কনভোকেশনে বীণা দাসের বাঙলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনের হত্যার চেষ্টা ও চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবের ফল।

বাঙলার বাইরে

শুধু বাঙলাতেই নয়, বাঙলার বাইরেও চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতবর্ষের একেবারে পূর্বপ্রান্ত থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত এ প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। চট্টগ্রামের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েই পেশোয়ারে অবস্থিত গাড়োয়াল সেনারা তাঁদের সর্বাধিনায়কের আদেশ অমান্য করে, নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণে অসম্মত হয়।

শোলাপুরের ঘটনা আরো গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের একমাসের মধ্যেই শোলাপুরের বিদ্রোহ। ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেই বিদ্রোহীরা একের পর এক শহরের সবগুলি থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। ইংরেজ অধিবাসীরা ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। শান্তি ফিরিয়ে আনতে মার্শাল ল' জারি করতে হয় বৃটিশ সরকারের, কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন ফল হয়নি। ইংরেজ রাজশক্তি কিন্তু এ বিদ্রোহকে 'শোলাপুর দাঙ্গা' নামে অভিহিত করেছে।

শুধু পেশোয়ার আর শোলাপুরই নয়, পাঞ্জাব ও দিল্লীতেও চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহ তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরই ফলে গুজরাটের দেবী চাঁদের নেতৃত্বে দিল্লীর ডেপুটি কমিশনারকে হত্যার ব্যাপক আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু অস্ত্রের জন্য সে আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়।

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর গুলি বর্ষণ করেন মর্দান-এর হরকিষণ। সেটা ১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বরের ঘটনা। গভর্ণর আহত হন বটে, কিন্তু প্রাণে বেঁচে যান। তাঁর দেহরক্ষীর মৃত্যু ঘটে।

আর একটি দিক দিয়ে বিচার করলেও আমরা বুঝতে পারি চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ কত ব্যাপক। বলছি সংখ্যাতত্ত্বের কথা। সরকারী খতিয়ানে দেখতে পাই যে ১৯২৯ সালে সারা ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার সংখ্যা মাত্র ১৭, ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের পর ১১৬, ১৯৩১-এ ১৬৪, ১৯৩২-এ ১৫৯। সরকারের এই সংখ্যাতত্ত্বের দিকে চেয়েই তদানীন্তন ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর বলেছিলেন, "ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন জোয়ার এসেছে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ থেকেই"।

যুব-বিদ্রোহের বাণী

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের যদি কোন বাণী থেকে থাকে তবে তা বাঙময় হয়ে উঠেছে মাষ্টারদার মৃত্যুর কর্মসূচীতে। মৃত্যু, অজস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমরা খুঁজে পাব স্বাধীনতার পথ, জীবনের পথ, মনুষ্যত্বের পথ। মরণ নদীর ওপারেই স্বাধীনতার মহাতীর্থ। মহামরণের এই কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়েই সংঘটিত হয়েছে জালালাবাদ যুদ্ধ, কালারপোল সংঘর্ষ, চন্দননগরের সশস্ত্র প্রতিরোধ, ধলঘাট অভিযান, পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ।

কিন্তু তাতেও যবনিকা পড়েনি মৃত্যুর এ কর্মসূচীর উপর। ঢাকা, কলকাতা ও মেদনীপুরে সার্থক হয়েছে মাষ্টারদার এ-কর্মসূচী। শুধু সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্রেই নয়, সত্য ও অহিংসার তাপস মহাত্মাজীও ১৯৪২-এর আগষ্ট বিদ্রোহে এই মৃত্যুর কর্মসূচীই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজেও দেখেছি এই প্রোগ্রামেরই অভিব্যক্তি। সত্য কথা বলতে কি, মহাত্মাজীর Do or Die, নেতাজীর, 'Give me blood, I will give you freedom' আর মাষ্টারদার Programme of death একই কর্মপন্থার বিভিন্ন অভিব্যক্তি। এইখানেই যুব-বিদ্রোহের সার্থকতা।

যুব-বিদ্রোহের লক্ষ্য ও আদর্শ

মহানায়ক সূর্য্যসেন ছিলেন বাস্তব পন্থী। সেইকারণেই স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করতে গিয়ে তিনি কোন অলীক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তাঁর শক্তি কতখানি তা তিনি জানতেন এবং সেই অনুপাতেই বিদ্রোহের কর্মপন্থাকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন। ছোট্ট তাঁর Indian Republican Army—এই সেনাদল নিয়ে সারা ভারতবর্ষে তিনি বিপ্লব ঘটাবেন এমন আকাশ-কুসুম কল্পনায় বিশ্বাস করতেন না সূর্য্যসেন। তাই চট্টগ্রামকে ঘিরেই তাঁর বিপ্লব পরিকল্পনা। একটি জেলাতেই সীমাবদ্ধ তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা। তবে সে প্রচেষ্টা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায়। চট্টগ্রামকে তিনি স্বাধীন করবেন। কেন? তাতেই কি সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবে? মাষ্টারদা বলেছেন, "তা যাবে না, তবে চট্টগ্রামের দৃষ্টান্ত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের একটা পথ খুঁজে পাবে"। কথার মার প্যাচ নেই, কোন হেঁয়ালি নেই মাষ্টারদার বক্তব্যে। তাঁর চিন্তাধারা যেমন সহজ, কর্মপন্থা তেমনি সরল। মাষ্টারদার সাফল্যের চাবিকাঠি এইখানেই।

"আমার শেষ বাণী—আদর্শ ও একতা" বলে গেছেন সূর্য্যসেন। দেশবাসীকে তিনি দিয়ে গেছেন স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। এই স্বাধীন ভারতই তাঁর কাম্য। এই তাঁর আদর্শ। এর বেশি কিছু তিনি বলেন নি। আদর্শের স্বরূপ তিনি বিশ্লেষণ করতে যান নি, কোন প্রয়োজন ছিল না বলে। সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল না। ছিল না এই জন্য যে, দেশ যখন পরাধীন তখন দেশবাসীর

একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেশকে পরাধীনতার বন্ধন হতে মুক্ত করা। মুক্তি-সংগ্রামের আগে, কিংবা সংগ্রাম যখন চলতে থাকে তখন স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে বিচ্ছিন্নতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এই কারণেই মাষ্টারদার শেষ বাণী শুধু আদর্শ নয়, একতাও। অসময়ে আদর্শের বিশ্লেষণ করলে একতার প্রাচীরে চিড় ধরতে পারে—এইখানেই ভয়। তাই মাষ্টারদা স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে তাঁর আদর্শের অর্থাৎ স্বাধীনতার বিশ্লেষণ করেন নি। এই প্রসঙ্গে বিশ্বের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মাও-সে-তুং বলেছেন : "For people deprived of national freedom, the revolutionary task is not immediate socialism, but the struggle for independence. We cannot even discuss communism if we are robbed of a country in which to practise it." প্রায় একই কথা বলেছেন সুভাষচন্দ্র-ও। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে এক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : "Socialism or reconstruction of national life on socialist basis before achieving our political emancipation is altogether premature." মাষ্টারদাও ঐ একই পথের পথিক। তাই আদর্শের কথাই তিনি বলে গেছেন, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন নি। এ বিশ্লেষণ সুরু হবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে তার পূর্ব্বে নয়। এজন্য ক্যাডারদের কারো কাছে তাঁকে কোন কৈফিয়ত দিতে হয় নি, কেননা তিনি ত তাঁর ক্যাডারদের সঙ্গেই থাকতেন সংগ্রামের পুরোভাগে। আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে যে অধিনায়ক রাতদিন সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষেন কৈফিয়ত তাকে দিতে হয় না কোনদিন কারো কাছে। তিনি যে সকল কৈফিয়তের ঊর্দ্ধে, সকল প্রশ্নের অতীত।

যে সব পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :—

১। ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিতরায়।
২। সবার অলক্ষ্যে : ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিতরায়।
৩। History of the Freedom Movement in India :
Parts II & III : Dr. R. C. Majumdar
৪। Roll of Honour : Kalicharan Ghosh.
৫। জাগরণ ও বিস্ফোরণ : কালিচরণ ঘোষ।
৬। বাঙলায় বিপ্লববাদ : নলিনী কিশোর গুহ।
৭। ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : সুপ্রকাশ রায়।
৮। দেশের কথা : সখারাম গণেশ দেউস্কর।
৯। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম : সুভাষচন্দ্র বসু।
১০। Report of the Sedition Committee.
১১। বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ : অখিল চন্দ্র নন্দী।
১২। ভারতের জাতীয় আন্দোলন : গৌরদাস হালদার।